বাজেট ২০১৮-১৯ এবং এক দশকের 'উন্নয়ন' চিত্র

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

পৃথিবীর যে কোন দেশেই বাজেট হল সরকার তথা শাসনক্ষমতায় যারা থাকে তাদের শ্রেণিচরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এবং মূলত শাসকশ্রেণির উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের বার্ষিক নকশা। সর্বজনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এটি বার্ষিক রাজনৈতিক দলিলও বটে। এদেশে বাজেটের ওপর নানা আলোচনায় বাজেটকে দেখা হয় একটা খন্ডিত দলিল হিসেবে, কিছু পরিসংখ্যানের সমষ্টি হিসেবে। কারণটা মোটেও অরাজনৈতিক নয়। এই প্রবন্ধে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণের পাশাপাশি গত এক দশকে সরকারের বাজেট বরাদ্দের নিরিখে উন্নয়ন নীতির মূল চিত্র উন্মোচন করা হয়েছে।

প্রচলিত বাজেট আলোচনা

বাজেট আসার পরপরই বেশির ভাগ মিডিয়ায় প্রথম রিপোর্টটা হয় 'বিশাল বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী' মর্মে। সরকারের তরফ থেকেও এই বিশাল বাজেটের বিষয়টিকে ফলাও করে প্রচার দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিশাল বাজেটের গল্প একটা বালখিল্য কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনীতি যেখানে বড় হচ্ছে সেখানে বাজেটও বড় হতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বিবেচনায় এই বাজেটগুলো বিশাল তো নয়ই, বরং চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের আসলে আরও বড় বাজেট দরকার যদি সত্যি সত্যিই বাজেটে জনগণের প্রয়োজন মেটানোর দিকটিতে লক্ষ রাখা হয়। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। সর্বজনকথারই বিগত দুটি সংখ্যায় বাজেট পর্যালোচনায় কাছাকাছি অর্থনীতির দেশগুলোতে বাজেটের আকার কত সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের উল্লেখ আছে।[১]

বাজেট নিয়ে এরপর যে আলোচনাগুলো আসে সেখানে প্রথমেই এটা থাকে যে এই বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য কি না? এই আলোচনার অবশ্যই একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। বিশেষত বিগত এক দশকে সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের হার যেভাবে কমছে সেই প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আলোচনাগুলো এমন সুরে আসে যে তাতে মনে হয় বাজেট বাস্তবায়নই যেন প্রধান বিষয়, বাজেট বাস্তবায়িত হলেই যেন সব কিছু ঠিক থাকবে। কিন্তু ব্যাপারটা তো বাস্তবে আদৌ তা নয়। পূর্ণ বাস্তবায়িত হওয়ার পরও একটা বাজেট দেশের অর্থনীতি ও মানুষের জন্য সর্বনাশের কারণ হতে পারে।

এ ছাড়াও আলোচনায় প্রাধান্য থাকে যেসব বিষয়ে সেগুলো হল : বাজেট ব্যবসাবান্ধব হয়েছে কি না, বিনিয়োগবান্ধব হয়েছে কি না, সামাজিক নিরাপত্তার নামে দান-খয়রাতি মার্কা কার্যক্রম কতটুকু বাড়ল কিংবা কমল এবং অবধারিতভাবেই কিসের কিসের দাম বাড়ল আর কিসের কিসের দাম কমল।

বাজেট বিষয়ক আলোচনাগুলো আরেকটা সমস্যা তৈরি করে খাতের সংজ্ঞায়ন নিয়ে। সরকার যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খাতের সংজ্ঞায়ন করে বাজেটে বরাদ্দের কতগুলো সংখ্যা উৎপাদন করে, মিডিয়ার লোকজন থেকে শুরু করে মূলধারার অনেক অর্থনীতিবিদ পর্যন্ত সেই খাতের সংজ্ঞায়ন নিয়ে কোন প্রশ্ন ছাড়াই সেই সংখ্যাগুলো হুবহু ব্যবহার করে। আর এতেই তৈরি হয় বিভ্রান্তি। যেমন–শিক্ষায় বরাদ্দের নামে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ চালিয়ে দেয়া হয় কোন প্রশ্ন ছাড়াই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিশাল বরাদ্দকেও চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মিডিয়া ও অর্থনীতিবিদদের মূলধারা এটা নিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না। কৃষি খাতের ভেতরে যে সরকার বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কেও ঢুকিয়ে দিয়ে কৃষি খাতের বরাদ্দ বেশি দেখাচ্ছে সেটা নিয়েও তাই কোন প্রশ্ন নেই। স্বাস্থ্য খাতের ভেতরে যেমন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকে। এমন উদাহরণ আরও আছে।

বাজেট বিষয়ক আলোচনাগুলোতে আরেকটি যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেটি হল সামরিক বাজেট নিয়ে দৃষ্টিকটু নীরবতা। আয়কর নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু আমাদের ট্যাক্স সিস্টেম যে প্রগ্রেসিভ না অর্থাৎ এখানে যে খুব বেশি আয় করলে তুলনামূলক বিচারে কম কর দিতে হয় সেটা নিয়ে কোন আলোচনা কিংবা হিসাব কদাচিৎ চোখে পড়ে।

মিডিয়ার এই বাজেট উপস্থাপনের দরুনই হোক কিংবা বাজেট বিষয়ক আলোচনার কাঠিন্যের কারণেই হোক সাধারণ মানুষের কাছে এখন বাজেটের মূল ফোকাস হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজেটে কিসের কিসের দাম বাড়ল আর কিসের কিসের দাম কমল। যেটি আসলে বাজেটের প্রধান বিষয় নয়। সেই সাথে এমন একটা অবস্থা এখানে তৈরি করে রাখা হয়েছে, যেন মানুষ ধরেই নিয়েছে যে সাধারণ মানুষের এখানে বলার কিছুই নেই। গরিবের আবার কিসের বাজেট? অথচ অবস্থাটা হওয়া দরকার ছিল এর ঠিক উল্টো। কারণ এই যে লক্ষ কোটি টাকার বাজেট হচ্ছে, তাতে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, সেটা জনগণেরই টাকা।

শাসকশ্রেণি, তাদের মিডিয়া, অর্থনীতিবিদ ও গবেষককুল যেভাবে জনগণকে বাজেটের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে অনাগ্রহী করে রাখতে পেরেছে সেটা তাদের একটি বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য। কারণ জনগণ যদি সরকারের কাছে এই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেটের প্রতিটি পয়সার বিস্তারিত হিসাব চাওয়া শুরু করে, প্রতিটি খাতে যত টাকা বরাদ্দ হল তার যৌক্তিকতা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করার দাবি তোলা শুরু করে এবং বাজেট সংসদে পাস করার আগে জনগণের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করার কোন প্রক্রিয়া দাঁড় করানোর দাবি তোলা শুরু করে তাহলে সেটি শাসকশ্রেণির জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, যারা এদেশে মেহনতি নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য রাজনীতি করে বলে দাবি করেন সেই সব রাজনৈতিক দলকেও বেশির ভাগ সময় বাজেট নিয়ে কিছু গড় কথা বলা ছাড়া (যেমন–গরিব মারা বাজেট, গণবিরোধী বাজেট ইত্যাদি) উপরোক্ত বিষয়গুলোতে কোন দাবি তুলতে দেখা যায় না। অথচ জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনায় এসব দাবি তোলা খুব জরুরি একটা কাজ।

বাজেট নাকি সংখ্যাতাত্ত্বিক ঢপের চপ?

একটা কথা বলে রাখা দরকার যে বাজেট বর্তমান বাংলাদেশে একটা

সংখ্যাতাত্ত্বিক ঢপের চপে পরিণত হয়েছে। সরকার বাজেটের যে আকার ঘোষণা করে সেটি প্রতিবারই বছর শেষে কমে যায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে। সত্যিকারের বাজেটের চেহারা বুঝতে হলে আমাদের তাই আসলে তাকাতে হবে প্রকৃত বাজেটের ডাটাগুলোতে। এ কারণেই এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলোতে গত একদশকের প্রকৃত বাজেটগুলোতে কী কী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার একটা সারাংশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ১০ বছরের প্রকৃত বাজেটগুলোতে তাকালে পরিষ্কারই দেখা যাবে যে সরকার আসলে যতটা ঢাক পেটায় বাজেটের আকার নিয়ে বাজেট আসলে তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক ছোট হয়। উদাহরণস্বরূপ উলেখ করা যায়, যেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটের ৯৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছিল, সেখান থেকে বাস্তবায়নের হার কমতে কমতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে ৭৮ শতাংশে নেমেছে।[২] শুধু তা-ই নয়, এই ১০ বছরের বাজেটগুলোর দিকে তাকালে আরও যেটা পরিষ্কার চোখে পড়বে তা হল কিভাবে সরকার ১০ বছর ধরে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বাজেটে ক্রমাগত অবহেলা করে 'উন্নয়ন' ঘটিয়ে চলেছে।

এ বছর অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন সেটির আকার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার পরিচালনার খরচ বা অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৮২ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। এবার বাজেটের মোট ঘাটতি ১ লাখ ২১ হাজার ২৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ এবারের বাজেটের চার ভাগের এক ভাগেরও বেশি হল ঘাটতি, যেটি দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ঋণ করে মেটানোর চেষ্টা করা হবে। এমনিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাড়াতে চাইলে ঘাটতি বাজেট দেয়া যেতেই পারে। সেটা বিভিন্ন দেশ দেয়ও। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আগে বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা তো পূরণ করতে হবে। গত এক দশকে, বিশেষত ৫ বছর ধরে রাজস্ব আদায়ের অবাস্তব টার্গেট নেয়ার যে প্রবণতা এবং এবারও যেহেতু সেই একই কাজ করা হয়েছে, তাই একথা এখনই বলে দেয়া যায় যে এই ঘাটতি আসলে পূরণ হবে না।

> কোন রকম সেবা না পেয়েও কর দিয়ে যাওয়া যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতায় পরিণত হতে পারে তার ক্লাসিক উদাহরণ হল রাজধানীর জুরাইন। যেটাকে এখন নরক বললেও কম বলা হবে। জুরাইন হল ঢাকা শহরের ভবদহ। বছরের পর বছর ধরে জুরাইনের রাস্তা তরল পয়োবর্জ্য ও কারখানার বর্জ্যে নিমজ্জিত। পানিবাহিত অসুখবিসুখ, চর্মরোগ এখন ওই এলাকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। জলমগ্ন রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সেখানে যানবাহন উল্টে ঘটছে দুর্ঘটনা। এমনকি মানুষ মারা যাওয়ার মত ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। মৃত মানুষের লাশটা পর্যন্ত পয়োবর্জ্য পাড়িয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এ এক নিত্য অপমানের জীবন, অমানুষের জীবন।

বাজেটে অর্থায়নের চেহারা : রাঘব বোয়ালদের নিষ্কৃতি

এবারের বাজেটের রাজস্ব আয়ের মধ্যে যথারীতি প্রধান অংশটা পরোক্ষ করের, প্রত্যক্ষ করের নয়। ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক–এগুলো হল পরোক্ষ কর, যেটি আসলে শেষ পর্যন্ত জনগণের ওপরই গিয়ে চাপে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ কর হল আয়কর ও কর্পোরেট কর। সরকার একদিকে আয়কর ও কর্পোরেট কর থেকে রাজস্ব আয়ের প্রধান অংশ পূরণ করার উদ্যোগ নেয় না, অন্যদিকে দেশ থেকে লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে যায় বিদেশে। শুধু তা-ই নয়, যেভাবে আয়কর বসানো হয় তাতে দেখা যায় যে যাদের আয় খুব বেশি তাদের তুলনামূলকভাবে শতাংশের হিসাবে কম কর দিতে হয়। এবং একটা পর্যায়ের পর আয়কর প্রদানের হার স্থির হয়ে যাবে, তা আপনি যত বেশিই আয় করুন না কেন।

শুধু কি তাই? চলমান মূল্যস্ফীতিতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় যেখানে দ্রুতগতিতে কমে গেছে এবং যাচ্ছে, সেখানে অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। কিন্তু অন্যদিকে ঠিকই ব্যাংক মালিকদের খুশি করার জন্য কর্পোরেট করহার কমিয়েছেন! আগে যেটা ছিল ৪০ শতাংশ, সেটি এখন ৩৭.৫ শতাংশ।

গত কয় বছরে দলীয় বিবেচনায় একের পর এক ব্যাংক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলো খোলার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যেন জনগণের টাকা লোপাট করা। এগুলো একের পর এক দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়েছে। আর এর মধ্যেই গত বছর সরকার ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ আইন সংস্কার করে সেখানে পরিবারতন্ত্র আরও জাঁকিয়ে বসার সুযোগ করে দিয়েছে, যেটি বাড়িয়ে দিয়েছে আরও বড় মেগা দুর্নীতি করার সুযোগ। ব্যাংক খাত একের পর এক নজিরবিহীন কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত। বেশ কিছু ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পথে। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার ভারতের চেয়ে বেশি এবং শ্রীলঙ্কার তুলনায় তিন গুণেরও বেশি।[৩] আর সরকার কী করছে? কয়েক দিন পর পর খেলাপি ঋণ অবলোপন করতে দিচ্ছে। সরকার ঋণখেলাপিদের বিচারের আওতায় না এনে, তাদের কাছ থেকে খেলাপি হওয়া ঋণ আদায়ের পথে না গিয়ে, ব্যাংকের দুর্নীতিবাজ পরিচালনা পর্ষদের রাঘব বোয়ালদের স্পর্শ না করে উল্টো বছর বছর জনগণের কষ্টার্জিত টাকা ব্যাংকগুলোতে ঢালছে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার নামে। এবার ব্যাংক মালিকদের কর্পোরেট করহারও কমানো হল।

সুতরাং রাঘব বোয়ালরা বিপুল অঙ্কের প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেবে, টাকা পাচার করে দেবে বিদেশে, ব্যাংক লুটে খাবে আর সরকার সাধারণ মানুষকে বলবে–তাহলে তোমাদের কষ্টার্জিত টাকা ঢালো 'ব্যাংক উদ্ধারে' আর ভ্যাট দাও বেশি করে। অর্থাৎ যা কিছুই হোক তার দায় টানতে হবে সাধারণ জনগণকেই! এই হল আমাদের বাজেটের অর্থায়নের আসল চেহারা (এবারের বাজেটে যেভাবে ছোট ফ্ল্যাটের ওপর ভ্যাট বাড়ানো হল এবং বড় ফ্ল্যাটের ওপর ভ্যাট কমানো হল এবং অনলাইনে যাঁরা কিছু একটা বেচাবিক্রি করে কোনমতে চলছিলেন তাঁদের ওপরও ভ্যাট বসানো হল, সেটি এই প্রবণতারই অংশ)।

ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বনাম জুরাইনবাসীর নরকযন্ত্রণা

বাংলাদেশে মূলধারার কোন কোন অর্থনীতিবিদসহ সরকার থেকেও প্রায়ই বলা হয় যে যেহেতু বাংলাদেশে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত অন্য অনেক দেশের তুলনায় কম, তাই এটি আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে। অর্থাৎ আরও বেশি করে ট্যাক্স উত্তোলনের সুযোগ আছে। খুব ভাল কথা। কিন্তু সেই কর শুধু সাধারণ মানুষ দেবে কেন? রাঘব বোয়ালরা কেন পার পেয়ে যাবে করের হাত থেকে? তা ছাড়া আমরা কর দেই কেন? সেবা পাওয়ার জন্যই তো? তো, এখন পর্যন্ত যে কর

মানুষ দিচ্ছে, তার বিপরীতে আমরা কী ধরনের সেবা পাচ্ছি কিংবা আদৌ কি কোন সেবা আমরা পাচ্ছি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তো কর বাড়ানোর আগে ফয়সালা করতে হবে। আমরা কর দিয়েই যাচ্ছি, অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থায় এ প্লাস বিক্রি হচ্ছে। আমরা কর দিয়েই যাচ্ছি, অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে আমরা চরম অবহেলার শিকার হচ্ছি, সেখানে মেশিনপত্র নষ্ট, ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকে না। সেখানে কোন কোন সময় সিজার করতে গিয়ে নবজাতকের মাথা ধড় থেকে আলগা করে ফেলা হচ্ছে। আমরা কর দিয়ে যাচ্ছি, অন্যদিকে পুলিশের কাছে কোন সাহায্যের জন্য যেতে আমরা ভয় পাই। কারণ আমরা জানি সেখানে গেলে হয়রানির চূড়ান্ত হবে। আমরা কর দিয়েই যাচ্ছি, অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের লোকেরা ৭ খুনের মত ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমরা কর দিয়েই যাচ্ছি, অন্যদিকে ৬ বছর ধরে চার লেন বানানো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক মাত্র কয়েক মাসেই ভেঙে যাচ্ছে।[৪] শহরের মানুষ কর দিয়েই যাচ্ছে, অথচ শহরাঞ্চলগুলোতে প্রকৃত নাগরিক সুবিধা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। আমরা কর দিয়েই যাচ্ছি আর ভিআইপিরা রাস্তা আটকে দিচ্ছে যখন-তখন ইচ্ছামত। উল্টো পথে চালাচ্ছে গাড়ি। আমরা কর দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মহাসড়কে মৃত্যুর মিছিল থামছে না। এমন উদাহরণ দিতে থাকলে দিয়েই যেতে হবে। সুতরাং এখন বরং সরকারকে পাল্টা প্রশ্ন করা দরকার যে কর দেব কেন? আগে বরং যতটুকু কর দিয়েছি আমরা সেই করের হিসাব দাও। সেই টাকা দিয়ে আমাদের যেসব সেবা পাওনা আছে সেগুলো আগে দাও।

কোন রকম সেবা না পেয়েও কর দিয়ে যাওয়া যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতায় পরিণত হতে পারে তার ক্লাসিক উদাহরণ হল রাজধানীর জুরাইন। যেটাকে এখন নরক বললেও কম বলা হবে। জুরাইন হল ঢাকা শহরের ভবদহ। বছরের পর বছর ধরে জুরাইনের রাস্তা তরল পয়োবর্জ্য ও কারখানার বর্জ্যে নিমজ্জিত। পানিবাহিত অসুখবিসুখ, চর্মরোগ এখন ওই এলাকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। জলমগ্ন রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সেখানে যানবাহন উল্টে ঘটছে দুর্ঘটনা। এমনকি মানুষ মারা যাওয়ার মত ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। মৃত মানুষের লাশটা পর্যন্ত পয়োবর্জ্য পাড়িয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এ এক নিত্য অপমানের জীবন, অমানুষের জীবন। অথচ সমাধানটা খুব সহজ ছিল। আর সেটি হল সামান্য ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করা আর এলাকার খালগুলোকে নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিষ্কার করা। কিন্তু সেদিকে সরকার কিংবা সিটি করপোরেশনের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।

অর্থমন্ত্রীর একমাত্র চিন্তা করের আওতা বৃদ্ধি। গতবারের মত এবারও সরকার বাজেটে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকার নাগরিকদের জন্য ন্যূনতম কর নির্ধারণ করেছে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকার নাগরিকদের জন্য ন্যূনতম কর নির্ধারণ করেছে ৪,০০০ টাকা এবং সিটি করপোরেশনের বাইরের নাগরিকদের জন্য কর আরোপ করেছে ৩,০০০ টাকা। ন্যূনতম আড়াই লাখ টাকার ওপর বার্ষিক আয় হলেই এই কর আপনাকে দিতেই হবে।[৫] এর সাথে যদি সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স যোগ করি তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? তাহলে এই প্রশ্ন ওঠা তো খুবই সংগত যে বছরের পর বছর পয়োবর্জ্যের মধ্যে দিন কাটানোর জন্য জুরাইনবাসী কেন কর দিবেন? শুধু জুরাইন কেন, ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি প্রান্তিক এলাকার দশা জুরাইনের চেয়ে খুব একটা আলাদা কি? বছরের পর বছর ধরে খোদ রাজধানীর রাস্তাঘাট কি বেহাল অবস্থায় ছিল সেটা কি আমরা ভুলে গেছি? এখন নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এলাকার রাস্তাঘাট ঠিক করা হচ্ছে নিম্নমানের কাজ দিয়ে, যেগুলো ইতোমধ্যেই ভাঙ্গা শুরু করেছে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অন্য সব কিছু না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু একটা এক ঘণ্টার বৃষ্টিপাত হলেই ঢাকা শহর অচল হয়ে যায়। এর পরেও কোন মুখে সরকার রাঘব বোয়ালদের নিরাপদে রেখে কেবল সাধারণ জনগণের কাছ থেকে নিত্যনতুন উপায়ে কর আদায়ের ফন্দিফিকির করে?

বাজেটের বরাদ্দগুলো মূলত কোথায় কিভাবে যায়?

যদিও স্রেফ বাজেটের বরাদ্দের দিকে তাকিয়ে কোন খাতে কতটুকু উন্নয়ন হচ্ছে সেটি বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ সেই বরাদ্দ আসলে কতটুকু কাজে লাগছে জনগণের, সেই বরাদ্দ দিয়ে যেসব কাজ করা হচ্ছে সেটি আদৌ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল কি না, নাকি সেগুলো স্রেফ অর্থের অপচয়–এসব বিস্তারিত তথ্য যতক্ষণ সামনে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত বরাদ্দের পরিমাণগুলো স্রেফ একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু কাঠামোগতভাবে সরকার কোন খাতকে আসলে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছে সেটি বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল বাজেটে বিভিন্ন খাতে সরকারের বরাদ্দ। তবে এই খাত অবশ্যই সরকারের বিভ্রান্তিকরভাবে নির্ধারিত খাত নয় (এই প্রবন্ধের শুরুতে যার কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে)। আমাদের তাকাতে হবে মূলত মন্ত্রণালয়ওয়ারি বরাদ্দের দিকে। একমাত্র তাহলেই আমরা এটি দেখে বাজেটের শ্রেণিচরিত্রের একটা পরিষ্কার আন্দাজ পেতে পারি।

এবার তাহলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন খাতের বরাদ্দগুলো দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে, বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে জনপ্রশাসনে–প্রায় ১৮ শতাংশ। এরপর সুদ পরিশোধে খরচ হবে বাজেটের ১১.০৫ শতাংশ। শিক্ষায় (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বাজেটের ১১.৪২ শতাংশ। তবে এর মধ্য থেকে যদি মাদ্রাসা ও কারিগরিকে বাদ দেই তাহলে শিক্ষায় সরকারের এবারের বাজেটে বরাদ্দ আসলে ১০.১৯ শতাংশ (তবে এই শিক্ষার বরাদ্দের চালচিত্র যে আসলে কী, এর মধ্যে কতভাগ অপচয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে সর্বজনকথারই শিক্ষা বাজেট বিষয়ক পূর্বতন সংখ্যায়)।[৬] স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বাজেটের ৭.০৩ শতাংশ। এর পরেই সামরিক খাতে বাজেটের বরাদ্দ ৬.২৬ শতাংশ। তার পরেই আছে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ, যেটি বাজেটের ৫.৭২ শতাংশ। এখন আমরা যদি মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, জনপ্রশাসন খাত বাদ দেয়ার পর এককভাবে অন্য যে কোন মন্ত্রণালয়ের চেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এবং তার পরের স্থানটিই জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতের। বাজেটে বরাদ্দের দিক থেকে এর পরের স্থানটি সড়ক যোগাযোগ ও মহাসড়ক বিভাগের (৫.২৫ শতাংশ)। তার পরের স্থানটি স্বাস্থ্য খাতের (৫.০৩ শতাংশ)। এর পরে রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ (৪.৯৪ শতাংশ)। এর পরের বাকি সকল ক্ষেত্রের বরাদ্দগুলোই ৪ শতাংশের নিচে। এবারের বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে আরও যেটি দেখা যাচ্ছে তা হল বেতন-ভাতা ও সুদ দিতেই চলে যাবে বাজেটের ৩৮.৫ শতাংশ!

বাজেটে সবচেয়ে অবহেলিত খাত কোনগুলো?

এবারের বাজেটে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে, যেটি বাজেটের প্রায় শূন্য শতাংশ (০.০৫%)। হিসাব

করলে দেখা যাবে, এবারের বাজেটকে যদি আমরা ২০০০ ভাগে ভাগ করি তাহলে তার মাত্র এক ভাগ জুটেছে দেশের অভ্যন্তরের শ্রমিকদের কপালে! দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বরাদ্দ জুটেছে সংস্কৃতি খাতে (০.১১ শতাংশ)। তৃতীয় সর্বনিম্ন বরাদ্দ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। চতুর্থ সর্বনিম্ন বরাদ্দ জুটেছে প্রবাসী শ্রমিকদের কপালে এবং সেটি মাত্র ০.১৩ শতাংশ। পঞ্চম সর্বনিম্ন বরাদ্দটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য (০.১৬ শতাংশ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ৫টি জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে সরকার বরাদ্দ করেছে সব মিলিয়ে মাত্র ০.৫৬ শতাংশ! বাজেটে ১ শতাংশেরও কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে এমন খাতগুলোর মধ্যে আরও আছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (বরাদ্দ মাত্র ০.২৭ শতাংশ! যা অষ্টম সর্বনিম্ন), শিল্প মন্ত্রণালয় (নবম সর্বনিম্ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (দশম সর্বনিম্ন) এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নৌ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো।

১০ বছরের বাজেটে 'উন্নয়নের' চেহারা

এবার আমরা গত ১০ বছরের বাজেটে (২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) 'উন্নয়নের' প্রকৃত চেহারাটা দেখব। এ ক্ষেত্রে বাজেটের ডাটা নেয়ার সময় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকৃত বাজেটের ডাটা নেয়া হয়েছে (যেহেতু এখন পর্যন্ত এই কটি অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটের ডাটা পাওয়া সম্ভব)। আর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ক্ষেত্রে সংশোধিত বাজেটের ডাটা নেয়া হয়েছে।

জনপ্রশাসন চালানোর খরচ

২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে জনপ্রশাসন চালাতে খরচ করা হয়েছিল মোট বাজেটের ৮.১২ শতাংশ। সেখান থেকে কমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জনপ্রশাসন খাতে প্রকৃত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪.৭৫ শতাংশ। আর সেখান থেকে লাফাতে লাফাতে জনপ্রশাসন চালানোর ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে পরবর্তী বাজেটগুলোতে। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এটি দাঁড়ায় ১১.২৩ শতাংশে। আর এবার প্রস্তাবিত বাজেটে এই ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ! সুতরাং হিসাব করলে দেখা যাবে, শতাংশের হিসাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় জনপ্রশাসনের ব্যয় বাড়ানো হয়েছে প্রায় ২.২৫ গুণ। আর ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় জনপ্রশাসনে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ৪ গুণ! সরকারি চাকরির বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবার বেতন কমিশনে যখন বেতন বাড়ানো হয় তখন বেতন বাড়ানো ছাড়াও আরও অনেক কিছুর সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সেগুলোর কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে?

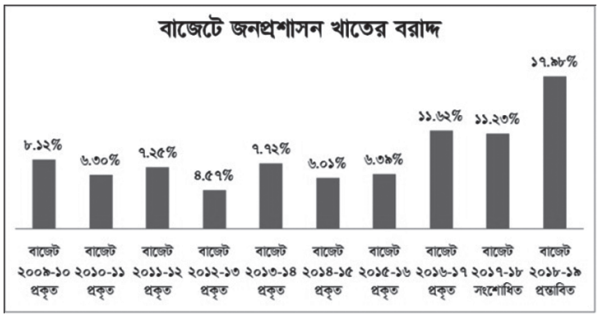

গত বছর থেকে সরকার গাড়ি কেনার জন্য উপসচিব পর্যায় থেকে ওপরের দিকে সুদমুক্ত ৩০ লাখ টাকা ঋণ দিচ্ছে। শুধু উপসচিবদের গাড়ি কেনার ঋণ দিতেই সরকারের ব্যয় হবে ৪৬৫ কোটি টাকা। শুধু তা-ই নয়, গাড়ির তেল খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও ড্রাইভার বেতন বাবদ উপসচিব থেকে ওপরের স্তরের প্রত্যেককে প্রতি মাসে বাড়তি ৫০ হাজার টাকা করে ভাতাও দিচ্ছে সরকার। শুধু এই ভাতা বাবদ স্রেফ উপসচিবদের পেছনেই সরকারকে বছরে বাড়তি ৯৩ কোটি টাকা খরচ করতে হবে![৭] এ বছর থেকে আবার মন্ত্রী-সচিবদের মোবাইল কেনার খরচ ১৫ হাজার টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাঁদের ফোনের যাবতীয় বিল দেবে সরকার![৮] সরকারি চাকরিতে বেতন আগে কম ছিল সেটা সত্য। কিন্তু বেতন বাড়ানো আর উচ্চপদস্থদের বিলাসী জীবন যাপনের সুযোগ দেয়া তো এক কথা নয়!

সামরিক খাতের বরাদ্দ আসলে কত?

সামরিক খাতে বেশ কিছু বছর ধরে প্রস্তাবিত বাজেটে ৬ শতাংশের কিছু বেশি বরাদ্দ দেখালেও প্রকৃতই যে বরাদ্দটা সামরিক খাতে খরচ হয় সেটি সব সময়ই এর থেকে অনেক বেশি। এই সরকারের গত ১০ বছরের মধ্যে মাত্র মাঝখানের দুটি বছর ছাড়া প্রতিবারই প্রকৃত বাজেটে সামরিক খাতের বরাদ্দ ৮ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। এবারও যেমন দেখানো হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দ ৬.২৭ শতাংশ, কিন্তু সেটি যে প্রকৃত বাজেটে গিয়ে আরও বেশি হবে তার আলামত কিন্তু ইতোমধ্যেই দেখাচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট। সেখানে সামরিক খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ছিল বাজেটের ৬.৪ শতাংশ। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে সেটি ইতোমধ্যেই মূল বাজেটের ৭.১১ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। সুতরাং এটিসহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সামরিক খাতের বরাদ্দও যে শেষ পর্যন্ত আরও অনেক বাড়বে তেমনটা বলাই যায়।

হিসাব করলে দেখা যাবে, গত ১০ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে প্রকৃত বাজেটে আক্ষরিকভাবেই অর্থাৎ টাকার অঙ্কে সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচের পরিমাণ যতটুকু বেড়েছে তার পরিমাণ ৯,০৬৩ কোটি টাকা! এই অর্থ এই অর্থবছরের (২০১৮-১৯) বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে উন্নয়ন ব্যয় তার চেয়ে ৭৫১ কোটি টাকা বেশি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে ৩,০৪৯ কোটি টাকা বেশি, স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তরের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে ২২ কোটি টাকা বেশি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমগ্র বাজেটের চেয়ে ৩,৪৭০ কোটি টাকা বেশি![৯]

অন্যদিকে সরকারি হিসাবে গত ১০ বছরে সামরিক খাতে বরাদ্দ প্রকৃত বাজেটে ৮ শতাংশের ওপরে দেখালেও একই বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ডাটা আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরের হালনাগাদকৃত তথ্যে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক খাতের ডাটা আছে। সেই ডাটা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই ৮ বছর ধরে বাজেটের ১২ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত সামরিক খাতে খরচ হয়েছে।[১০] বিশ্বব্যাংকের এই ডাটা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে সামরিক খাতের বরাদ্দ সরকার বাজেটের যত শতাংশ দেখাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এটি তার প্রায় দ্বিগুণ! উল্লেখ্য, প্রায় দুই দশক ধরে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সামরিক খাত নিয়ে এই ডাটা দিয়ে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোথাও কোন প্রতিবাদ করা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বিশ্বব্যাংকের এই ডাটা যদি সঠিক হয়ে

থাকে তাহলে এই হিসাব না দেখানো বিপুল অঙ্কের অর্থের হিসাব কই?

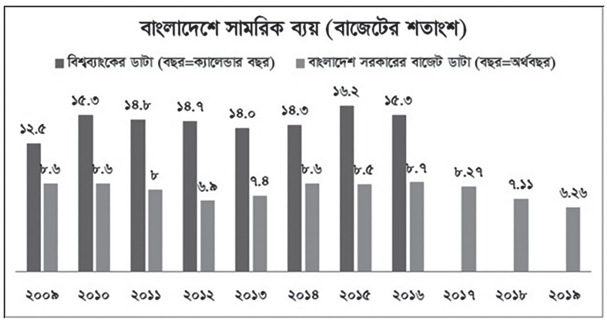

জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ নাকি জনগণকে দমন করার জন্য বরাদ্দ?

১০ বছর ধরেই জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে প্রস্তাবিত বাজেটে যতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয় প্রকৃত বাজেটে গিয়ে সেই বরাদ্দ তার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। শতাংশের হিসাবে প্রকৃত বাজেটে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকেই ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এবং সেটা বাড়তে বাড়তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে বাজেটের ৭.৩ শতাংশে পৌঁছে যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ, যেখানে ওই বছর প্রস্তাবিত বাজেটে এটি ছিল ৫.১ শতাংশ। সুতরাং এবারের ২০১৮-১৯ এর প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে যে ৫.৭ শতাংশ বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সেটি নিশ্চিতভাবেই প্রকৃত বাজেটে গিয়ে অনেক বেশি হবে। উপরন্তু সামনে নির্বাচন। হিসাব করলে দেখা যাবে, গত ১০ বছরে এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটে গড়ে ৫.২ শতাংশ করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর প্রকৃত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে গড়ে ৬.৪ শতাংশ করে। উল্লেখ্য, জননিরাপত্তা খাতে বাজেটের এত বেশি বরাদ্দ খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নেই। ইউরো স্ট্যাটের হিসাবে সেদেশে এই খাতে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ![১১] অন্যদিকে হিসাব করলে আরও দেখা যাবে, গত ১০ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে প্রকৃত বাজেটে আক্ষরিকভাবেই, অর্থাৎ টাকার অঙ্কে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার পেছনে খরচের পরিমাণ যতটুকু বেড়েছে তার পরিমাণ ৭,৭৬৮ কোটি টাকা![১২] এই বিপুল অঙ্কের বরাদ্দ বৃদ্ধিরও কোন ব্যাখ্যা নেই।

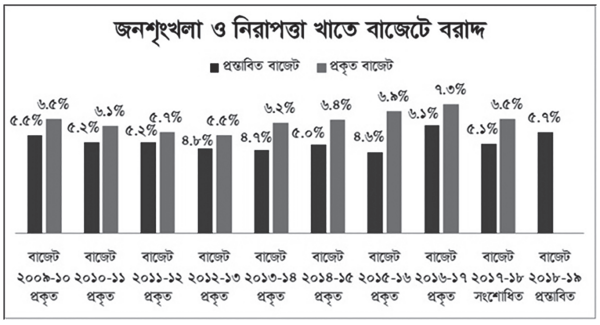

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নামে বাজেটে এত বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে, সেই টাকাটা আসলে মানুষের কী কাজে লাগছে? এই খাতের সিংহভাগ বরাদ্দ মূলত যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে। এই খাতের বরাদ্দ নিয়ে এভাবে প্রশ্ন তোলার দরকার পড়ত না যদি দেশে একটা ন্যূনতম মাত্রায় হলেও আইনের শাসন বলে কিছু থাকত। কিন্তু গত ১০ বছরের অবস্থা আমরা কী দেখছি? গত ১০ বছরে গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা, ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলা–সব কিছুই আগের তুলনায় ভয়াবহভাবে বেড়েছে এবং উত্তরোত্তর বাড়ছেই। দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কি? জনগণের অভিজ্ঞতা কী বলে? যারা ক্ষমতাবান, যাদের টাকার জোর আছে তারা ছাড়া অন্য সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে এমন ঘটনা গত ১০ বছরে নিশ্চয়ই হাতে গোনা যাবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যেতেই ভয় পায়। গেলে উল্টো চরম হয়রানি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। সন্ত্রাস, ধর্ষণ, খুন, মাদক ব্যবসাসহ সকল অপকর্মেই এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের জড়িত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে প্রভাবশালীরা একের পর এক অপকর্ম করে পার পাচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকেই ধরতে পারে না। এমনকি এই লেখা যখন লিখছি তখন এমপিপুত্র শাবাব গাড়িচাপা দিয়ে মানুষ মেরে ২০ লাখ টাকা দিয়ে আপস করে পার পেয়ে গেছে।

সাগর-রুনি মারা যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কারও বেডরুম পাহারা দেয়া সরকারের কাজ নয়। তাহলে কী পাহারা দিতে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় বরাদ্দ এভাবে বাড়ছে, সেই প্রশ্ন তো আমরা করতেই পারি। এর উত্তর পাওয়া যাবে গত ১০ বছরের আন্দোলনগুলোর দিকে তাকালে। গত ১০ বছরে সাধারণ মানুষের যে কোন ন্যায্য প্রতিবাদ বা দাবি আদায়ের আন্দোলনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা ক্রমাগতই আগের চেয়ে অনেক বেশি দমনমূলক, নিপীড়নমূলক, নির্যাতনমূলক ও উত্তরোত্তর বর্বরোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। জাতীয় সম্পদ রক্ষার ইস্যুতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আন্দোলন, সুন্দরবন রক্ষায় সর্বজনের আন্দোলন, শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছাত্রদের কোটা আন্দোলন কিংবা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনসহ যে আন্দোলনই মানুষ রাস্তায় নেমে করুক না কেন, যতই শান্তিপূর্ণভাবে করুক না কেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারের নির্দেশে সেখানে হামলে পড়েছেই।

পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের হামলে পড়ার যাতে আরও সুবিধা হয় সে জন্য নিত্যনতুন ধরনের অস্ত্র তাদের ভান্ডারে যোগ হচ্ছে : নতুন ধরনের টিয়ার গ্যাস, পিপার স্প্রে, সাউন্ড গ্রেনেড, নতুন ধরনের জলকামানসহ আরও কত কী! সুতরাং কাগজে-কলমে সংবিধানে কিংবা আইনে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে বর্তমান বাংলাদেশে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতের সিংহভাগ বরাদ্দের সাথে আসলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কোন সম্পর্ক নেই। এই খাতের সিংহভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষকে দমন-পীড়নের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে একথা বলাটা তাই ভুল কিছু হবে না। (এই প্যারাটি লেখা সবেমাত্র শেষ করার পর রাত তিনটার দিকে ফেসবুকে লাইভ দেখতে হল কিভাবে ওয়ারেন্ট ছাড়া এক বাসায় ঢুকছে পুলিশ, কিভাবে তাঁর সাংবাদিক কন্যা বারবার পুলিশের কাছে ওয়ারেন্ট দেখতে চেয়েছেন এবং তারা সেটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েও সিঁড়ির লাইট নিভিয়ে দিচ্ছে, দরজা ধাক্কাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢোকার পর মোবাইল কেড়ে নেয়ার জন্য অর্ডারও দিচ্ছে, যাতে আর লাইভ না হতে পারে! এর কদিন পর একই কায়দায় ডিবি পুলিশ গভীর রাতে প্রবেশ করেছে সিপিবি নেত্রী লাকী আখতারের বাসায়।)

বাংলাদেশকে ভয়াবহ হুমকিতে ফেলার জন্য এবারের বাজেটে

সরকারের বরাদ্দ কত?

সরকার তার পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্যান বা পিএসএমপি-২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশে ৭২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজ শুরু করেছে। পারমাণবিক সক্ষমতাহীন দেশে, ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এসব পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে বড় জননিরাপত্তার হুমকি আর কোন কিছুই নয়। জনগণকে অন্ধকারে রেখেই এই কাজ চলছে। আমাদের এখন এই হিসাব করতেই হবে যে জননিরাপত্তাকে আক্ষরিক অর্থেই ভয়াবহ হুমকিতে ফেলার জন্য বাজেটের কত শতাংশ বরাদ্দ হল। এবারের বাজেটে সরকার রূপপুর প্রকল্প বাবদ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের সমীক্ষা বাবদ মোট বরাদ্দ রেখেছে ১১ হাজার ৭৪৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।[১৩] সুতরাং এটা বলাই যায় যে এবারের বাজেটের মোট ২.৫ শতাংশ আসলে ব্যয়িত হবে জননিরাপত্তাকে ভয়াবহ হুমকিতে ফেলার জন্য।

শিক্ষার বরাদ্দে 'সৃজনশীল ছন্দময়' পতন

শিক্ষা খাতের গত ১০ বছরের বরাদ্দের দিকে তাকালে একটা 'সৃজনশীল ছন্দময় পতন' দেখা যাবে। কয়েক বছর ধরে নামে, তারপর ওঠে, তারপর আবার এখন নামছে। 'সৃজনশীল' শিক্ষার প্রবর্তকদের একটি সৃজনশীল কর্মই বটে! সরকার ফলাও করে প্রচার করছে যে শিক্ষা খাতে এ বছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (১১.৪২ শতাংশ)। কিন্তু আসল ঘটনা হল সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিক্ষায় যে বরাদ্দ দিয়ে শুরু করেছিল (প্রকৃত বাজেটের ১৫.৩ শতাংশ), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ শতাংশের হিসাবে তার চেয়ে ৩.৮৮ শতাংশ কম! এমনকি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটের তুলনায় এই বরাদ্দ প্রায় ৪.৬৩ শতাংশ কম। যা হোক, তিন বছর ধরে শিক্ষার বরাদ্দ কমছেই। অন্যদিকে সরকার যতই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার ঢাক পেটাক না কেন শিক্ষা খাতে বরাদ্দের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড হল বাজেটের ২০ শতাংশ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ, যেটা বাংলাদেশে কখনই ঘটেনি।

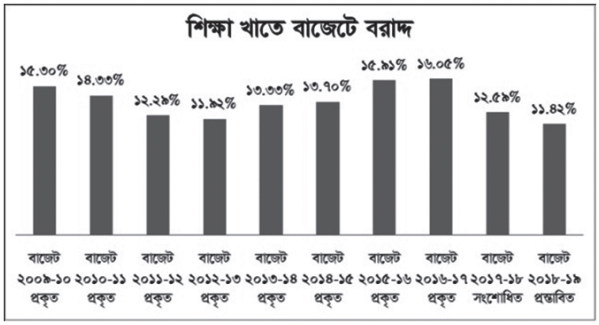

বাংলাদেশের চেয়ে অনেক গরিব দেশ হয়েও শিক্ষা খাতে বাজেটের ২০ শতাংশের ওপর বরাদ্দ দিচ্ছে এমন দেশগুলোর তথ্য আছে সর্বজনকথার বিগত সংখ্যায়।[১৪] এ ক্ষেত্রে কয়েক বছরের পুরনো তথ্য হচ্ছে, বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির কত শতাংশ সেটা হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে ১৫৫তম![১৫] এদিকে শিক্ষা খাতে এযাবৎকালে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে যে বছর সেই ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতের এডিপির বরাদ্দের ১১.৩ শতাংশই ছিল প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ প্রায় ১,৫২৮ কোটি টাকা! সেই বছরের শিক্ষা খাতের এডিপির বরাদ্দের নয়ছয়ের আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সর্বজনকথার বিগত সংখ্যায়।[১৬]

স্বাস্থ্য বাজেটের এক দশকের পুষ্টিহীনতা

এক দশক ধরে স্বাস্থ্য খাত পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এ ক্ষেত্রে কয়েক বছরের পুরনো তথ্য হল, জিডিপির শতাংশের অনুপাতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৮৯তম![১৭] বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে যতটা বরাদ্দ দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর শুরু করেছিল (প্রকৃত বাজেটের ৬.১৭ শতাংশ), সেই পরিমাণ বরাদ্দ এর পরের গত ৯ বছরের কোনবারেই করেনি। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে বাজেটের ৫.০৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত প্রতিবছরই স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ শতাংশের হিসাবে কমতে কমতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.৯১ শতাংশে নেমে আসে। এর পরের তিন বছরে সেই বরাদ্দ বলতে গেলে 'পেটেভাতে' কিছুটা বেড়ে ২০১৫-১৬ সালে ৫.২৯ শতাংশ হয়। এরপর দুম করে নেমে গিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে খরচ হয় বাজেটের মাত্র ২.৪৬ শতাংশ! যার কোন ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত সরকার দেয়নি। যা হোক, আমরা যদি স্বাস্থ্য খাত থেকে পরিবার কল্যাণ ও মেডিক্যাল শিক্ষা বাবদ খরচের অংশটা বাদ দেই তাহলে দেখা যাবে, স্বাস্থ্য খাতে গত বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪.৪১ শতাংশ। আর এ বছর সেটা আরও নেমে গিয়ে ৩.৯১ শতাংশ হয়েছে।

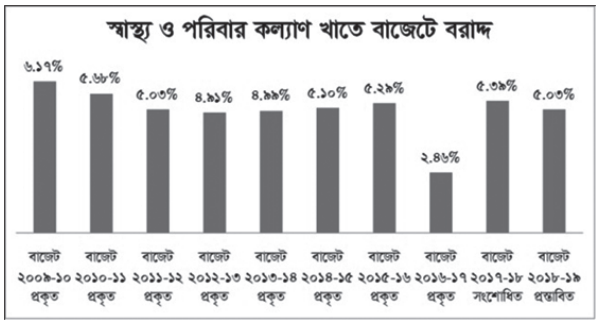

'কৃষিবান্ধব' সরকারের কৃষি বাজেট

কৃষিতে এবার ভর্তুকি বেড়েছে বলে কেউ কেউ এটাকে ইতিবাচক হিসেবে বলেছেন। তবে ইতোমধ্যেই কৃষক নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে এই ভর্তুকি মূলত চলে যাবে মধ্যস্বত্বভোগী আর ফড়িয়াদের পেটে। কৃষকের তাতে লাভ হবে খুব কম। কৃষক নেতারা ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন যে কৃষি খাতে সরকার এবার যে বরাদ্দ দিয়েছে সেটি খুবই অপ্রতুল।

অন্যদিকে কৃষি খাতে অযৌক্তিকভাবে যে ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই খাতগুলোর বরাদ্দকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের দিকে তাকাই তাহলে একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পাব। শুধুমাত্র ২০১২-১৩ অর্থবছর ছাড়া ১০ বছর ধরে বরাদ্দ কমছে। আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেটে ৭.২৩ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে শুরু করেছিল। পরের দুই বছর বরাদ্দ কমেছে। তারপর ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় বাজেটের ৮.৫২ শতাংশ। এর পর থেকে পরবর্তী ৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমতে কমতে ২.৭৮ শতাংশে

নেমে আসে। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সেটি সামান্য কিছু বাড়লেও এখনও সেটি বাজেটের মাত্র ২.৯৯ শতাংশ! সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১০ বছর আগের তুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাজেটের শতাংশের হিসাবে বরাদ্দ কমে প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। আর ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এই বরাদ্দ কমে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে।

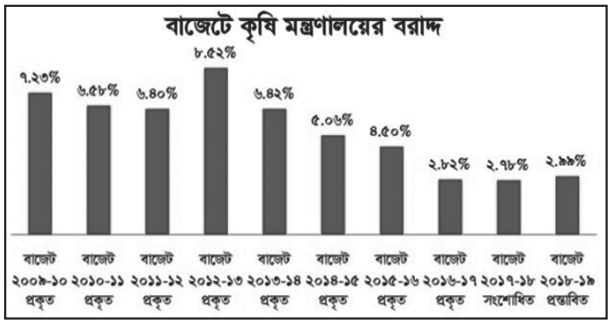

উল্লেখ্য, আমরা যদি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত যোগও করি তাহলেও মূল প্রবণতাটি প্রায় একই থাকবে। একদিকে কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে মনের দুঃখে ফসল নষ্ট করে দিতে বাধ্য হবে, অন্যদিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমতেই থাকবে–এটা কেমন কথা? অন্যদিকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে যতটুকু বরাদ্দ দিয়ে শুরু করেছিল (১.৮১ শতাংশ) ততটুকু বরাদ্দ গত ৯ বছরে আর কখনও দেয়নি। এবং তিন বছর ধরে এই খাতের বরাদ্দও কমছে।

এক দশকে পরিবেশ খাতের 'গুরুত্ব'

বাজেটে পরিবেশ খাতে গত ১০ বছরের বরাদ্দগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে–প্রথমত, পরিবেশ খাতে সরকারের বরাদ্দ একেবারে হাস্যকর রকমের কম, যেটি জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে থাকা একটি দেশের জন্য একেবারেই মানানসই নয়। অন্যদিকে গত ১০ বছরে পরিবেশ খাতের বরাদ্দ কমতে কমতে তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। এই অর্থবছরে সেটি ০.২৭ শতাংশ। এই হল সরকারের পরিবেশকে গুরুত্ব দেয়ার নমুনা।

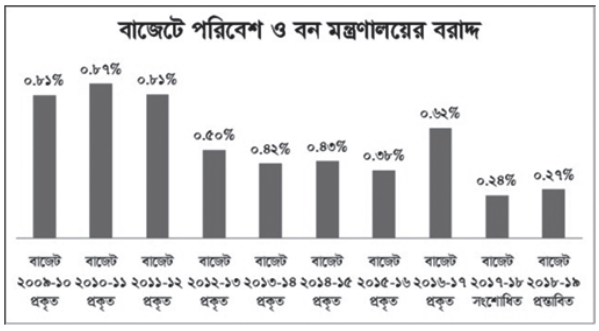

একদিকে পরিবেশের জন্য খুদকুঁড়া বরাদ্দ দেয়া হবে, অন্যদিকে বলা হবে পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত লোকবল নেই। আরেক দিকে আমরা বছরের পর বছর দেখতে থাকব বুড়িগঙ্গার কালো পানি। আর আমাদের হয়ত চুপ করে দেখতে হবে সাভারে স্থাপিত নতুন ট্যানারি পার্কের ভয়াবহ দূষণে ধলেশ্বরীর মারা যাওয়া। আরেক দিকে সুন্দরবনের মধ্যে কয়লাবাহী জাহাজ ডুববে একের পর এক আর সেগুলো ওঠাতে মাসের পর মাস লেগে যাবে। সরকার আবার ইদানীং জলবায়ু বাজেটও দিচ্ছে! বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে অকার্যকর বানিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু না। এই লেখা যখন লিখছি তখন কারখানার বর্জ্যের দূষণে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীতে মরা মাছ ভেসে উঠছে।

পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য এবারের বাজেটে সরকারের বরাদ্দ কত?

সুলভে পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করার নানা উপায় থাকলেও সরকার তার পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্যান বা পিএসএমপি-২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশে ১৯,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার কাজ শুরু করেছে। এই মর্মে সরকার কাজ এগিয়েও নিয়ে যাচ্ছে। রামপাল নিয়ে তীব্র আন্দোলন হওয়ার কারণে সেটির ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা ধীরে চলো নীতিতে আছে। কিন্তু এগিয়ে চলছে মাতারবাড়ীসহ অন্য বেশ কিছু কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ। ভয়াবহ পরিবেশদূষণের কারণে যেখানে সারা দুনিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরে আসছে ক্রমাগত, সেখানে বাংলাদেশ সরকার হাঁটছে উল্টো পথে। দেশজুড়ে বসাতে যাওয়া এসব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যে দেশের প্রাণ প্রকৃতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে তা নিয়ে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। অথচ বাংলাদেশে যে কয়লা ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার ছাড়াই কেবল গ্যাস ও পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়েই তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে সেটি তো এখন প্রমাণিত।

এবারের বাজেটে বিভিন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সংশিষ্ট ১১টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৮৭৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা[১৮] যা এবারের বাজেটের প্রায় ০.৮ শতাংশ। অন্যদিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য দূষণের কথা চিন্তা করে আমরা যদি এবারের বাজেটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাবদ বরাদ্দটাও এটার সাথে যোগ করি তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে পরিবেশ রক্ষার জন্য সরকার এবারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে মাত্র ০.২৭ শতাংশ বরাদ্দ রাখলেও দেশের পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য মোট বাজেটের প্রায় ৩.৪ শতাংশ ব্যয় করতে যাচ্ছে!

সরকারি বাজেটে শ্রমিকরা মানুষ হিসেবেই গণ্য নয়

আক্ষরিক অর্থেই এই মজুরদের দেশে ১০ বছর ধরে শ্রমিকদের জন্য বাজেটের প্রায় শূন্য শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে সরকার। শুধু তা-ই নয়, সেই প্রায় শূন্য শতাংশ পরিমাণ বরাদ্দও যত দিন গেছে তত কমেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এটা নিয়ে এমনকি শ্রমিক সংগঠনগুলোকেও তেমন কিছু বলতে শোনা যায় না! এ বছর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ মাত্র ০.০৪৯ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেটে শতাংশের হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যে খুদকুঁড়া বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, এই বছরের শ্রম ও

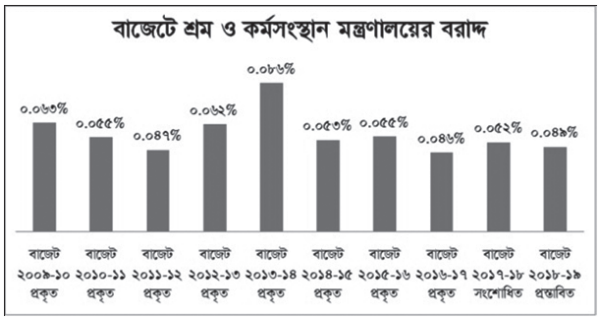

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট সেই খুদকুঁড়ারও তিন ভাগের দুই ভাগ! শুধু তা-ই নয়, এ বছরের শ্রমিকদের পেছনে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে এই খাতে যত বরাদ্দ ছিল তার মাত্র অর্ধেক! দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড যে শ্রমিকরা, তাদের যে সরকার মানুষ বলেই গণ্য করে না শ্রমিকদের পেছনে এক দশক ধরে এই প্রায় শূন্য শতাংশ বরাদ্দ তারই অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কাজ হচ্ছে সারা দেশে কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের তার প্রাপ্য অধিকার, মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা আইন মোতাবেক প্রদান করা হচ্ছে কি না সেটি দেখা এবং সেই সাথে কারখানার অভ্যন্তরে নিরাপত্তার (ভৌত, বৈদ্যুতিক ও অগ্নি) ব্যবস্থাগুলো অর্থাৎ শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার বিধানগুলো ঠিকঠাকমত পালন করা হচ্ছে কি না সেটার তদারকি করা। পত্রিকায় কয়েক দিন পর পরই খবর আসে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রকট লোকবল সংকটের কারণে কারখানাগুলো ঠিকঠাকমত পরিদর্শন করতে অক্ষম। তার পরও সরকার শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বাড়ায়নি। এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে একটি দক্ষ ও সক্ষম সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ন্যূনতম যে অর্থ দরকার, সেই অর্থও সরকার কোন দিন এই সংস্থার পেছনে বরাদ্দ করেনি। ২০১৩ সালে খবর আসে ২৮ হাজার অননুমোদিত গার্মেন্ট কারখানার জন্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক মাত্র ৩৯ জন ছিল![১৯]

অন্যদিকে বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিকের মৃত্যুর খবরও পত্রিকায় আসে নিয়মিত। গত বছর খবর বেরিয়েছিল যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বয়লার পরিদর্শন দপ্তরে সারা দেশের অনুমোদিত ৫,০০০ বয়লার পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক আছে মাত্র ৮ জন![২০] এর সাথে যদি অননুমোদিত বয়লারগুলোর সংখ্যাও যোগ করি তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? উলেখ্য, শিল্প মন্ত্রণালয়েও সরকারের বরাদ্দ গত এক দশকে মূলত নিয়মিতভাবে কমেছে। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ মাত্র ০.২৯ শতাংশ। এটি ২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যে বরাদ্দ তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ!

প্রবাসী শ্রমিক হল শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর মেশিন

দেশের ভেতরের শ্রমিকদের ব্যাপারে সরকার বাজেটে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে দেশের বাইরের প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সরকারের গত এক দশকের বাজেটগুলো একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করছে। সরকারের কাছে প্রবাসী শ্রমিক হল শুধু রেমিট্যান্স বানানোর মেশিন। তারা রক্ত জল করে রেমিট্যান্স পাঠাবে আর সরকার সেই রেমিট্যান্সের শক্তিতে আনন্দে ডুগডুগি বাজিয়ে লুণ্ঠন ও পাচারের পৃষ্ঠপোষকতা

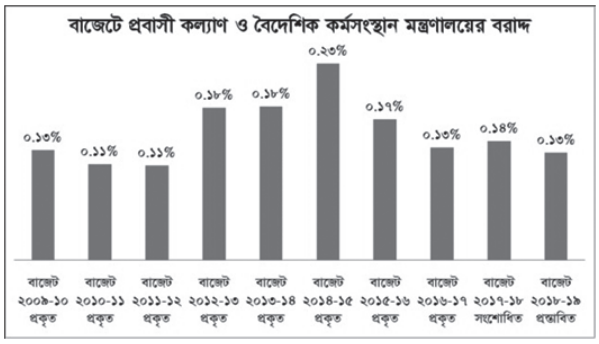

করবে। আর তাই এক দশক আগে সরকার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যে মাত্র ০.১৩ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে শুরু করেছিল, আজ এক দশক পর বাজেটে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ঠিক ততটুকুই আছে! শুধু তা-ই নয়, প্রকৃতপক্ষে ৫ বছর ধরে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ক্রমাগত কমেছে। এই অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বরাদ্দ, সেটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক! প্রবাসী শ্রমিকদের ভয়ানক দুর্দশার খবর প্রতিনিয়তই পত্রিকায় আসছে। তার পরও সরকার তাদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর কথা চিন্তা করেনি।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতের গুরুত্ব বাজেটে ক্রমাগত কমছেই

বাজেটের শতাংশের হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত কমানো হয়েছে গত ১০ বছরে। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছর শুরু করেছিল এই খাতে ৬.৮৫ শতাংশ বরাদ্দ নিয়ে। কিন্তু এর পর থেকে পরবর্তী নয় বছরের আর কোন বছরেই এই খাতে সরকার এই অনুপাতে বরাদ্দ রাখেনি। পরবর্তী নয় বছরের মধ্যে দুটি অর্থবছর ছাড়া বাকি সকল অর্থবছরেই এই খাতে বরাদ্দ শতাংশের হিসাবে আগের বছরের তুলনায় কমানো হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬.৪৩ শতাংশ করা হলেও এরপর গত চার বছর এই খাতের বরাদ্দ শতাংশের হিসাবে কমছেই।

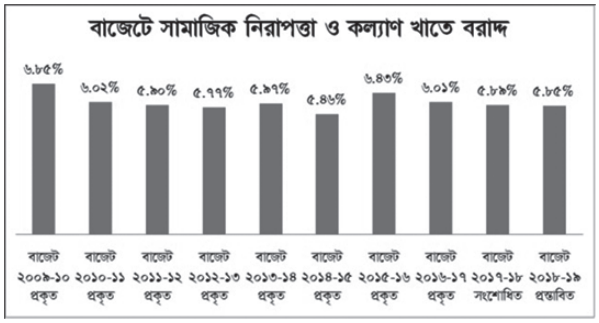

এদিকে জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন বা ইউএন এসকাপের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণ অনেক কম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আছে। ন্যূনতম একটি সামাজিক কর্মসূচির আওতায় আছে বাংলাদেশে এমন মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৮.৪ শতাংশ। অথচ শ্রীলঙ্কায় এই হার ৩০.৪ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৩৭.৯ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৪৭.১ শতাংশ এবং মঙ্গোলিয়ায় ৭২.৪ শতাংশ! ওই প্রতিবেদনে যে ১১টি দেশের কথা উলেখ আছে সেগুলোর মধ্যে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পেছনে আছে কেবল ভারত। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকারের ব্যয় জিডিপির কত শতাংশ সেই হিসাব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া আর সব দেশের থেকেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে! যেখানে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার জিডিপির মাত্র ১.৭ শতাংশ ব্যয় করছে, সেখানে ভারত এই খাতে ব্যয় করছে জিডিপির ২.৭ শতাংশ। এমনকি আমাদের গরিব প্রতিবেশী দেশ ছোট্ট ভুটান পর্যন্ত এই খাতে ব্যয় করছে জিডিপির ২.৭ শতাংশ, নেপাল ৩ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কা ৬.৫ শতাংশ![২১]

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বরাদ্দও কমছে

সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দও কমিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার বন্যা হয়। আর পত্রিকায় খবর পাই, সরকারের পাঠানো ত্রাণ অপ্রতুল। এর পরও সরকার এই খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে কমিয়ে যাচ্ছে। গত বছর হাওরে এত বড় দুর্যোগ হল। তার পরও সরকার বরাদ্দ কমাল এই খাতে। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ৩.৭৬ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে শুরু করেছিল। এরপর গত ১০ বছরে আর কখনও সরকার এ খাতে এতটা বরাদ্দ দেয়নি। উল্টো ৪ বছর ধরে এই খাতে বরাদ্দ টানা কমছে।

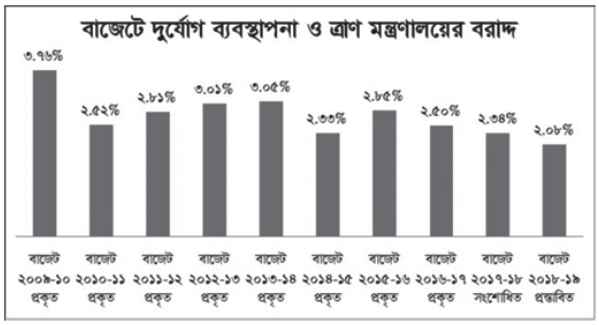

পাট খাতের প্রতি সরকারের গুরুত্বের ধরন

সরকারের তরফ থেকে ইদানীংকালে বেশ কয়েকবারই বলা হয়েছে যে তারা নাকি পাটখাতকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই গুরুত্ব দেয়ার নমুনা হল এই যে গত ১০ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ একেবারেই অপ্রতুল হিসেবে রয়ে গেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবছরই পাট খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ছিল ০.১ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই বরাদ্দ দ্বিগুণ হলেও দুই বছর ধরে এই বরাদ্দ আবার কমানো হয়েছে। বর্তমানে পাট খাতে সরকারের বরাদ্দ ০.১৬ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের তিন ভাগের দুই ভাগ। কিছুদিন আগে এক বাংলাদেশি বিজ্ঞানী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে পাটের পলিথিন আবিষ্কার করলেন। সেটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় রিপোর্টও হল। কিন্তু তার কয়েক দিন পরই আবার খবর এল যে ওই বিজ্ঞানী অভিযোগ করেছেন যে মাত্র ১৭০ কোটি টাকার অভাবে ওই বিপুল সম্ভাবনাময় পাটের পলিথিন বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।[২২] এই হল অবস্থা। সরকার একদিকে পাট খাতের বরাদ্দ কমাবে, অন্যদিকে বিপুল সম্ভাবনাময় ও পরিবেশবান্ধব একটি প্রকল্পে এই সামান্য ১৭০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করতেও গড়িমসি করবে।

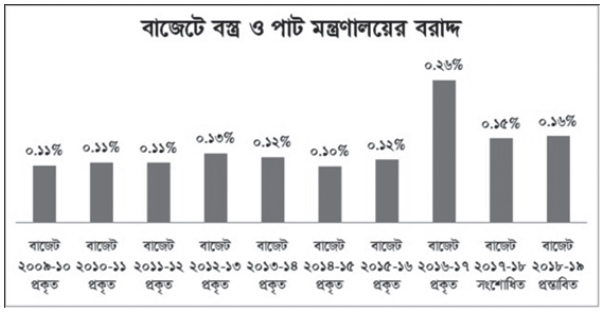

নারী ও শিশুদের অবস্থা কী?

সরকার কুমিরের এক ছানাকে বার বার নানা কায়দায় দেখিয়ে ইদানীংকালে গালভরা নামে নারী বাজেট, শিশু বাজেট দিচ্ছে। সেখানে ফলাও করে দেখানো হচ্ছে কোন মন্ত্রণালয়ের কত শতাংশ নারী ও শিশুর জন্য ব্যয়িত হবে। এই যেমন এবারের শিশু বাজেটে দেখানো হয়েছে যে মোট ১৫টা মন্ত্রণালয়/বিভাগ নাকি তাদের মোট বাজেটের ৪৩.৫ শতাংশ খরচ করবে শিশুসংক্রান্ত কাজে! কী কী জিনিসকে যে শিশুসংক্রান্ত কাজের আওতায় ফেলা হচ্ছে, সেগুলো আদৌ শিশুসংক্রান্ত কাজের আওতায় ফেলা যায় কি না সেটি প্রকৃত অবস্থাটা না দেখে বলা সম্ভব নয়। তবে একটা উদাহরণ দেয়া যায় : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তার এবারের বাজেটের ৮.৮৬ শতাংশ খরচ করবে শিশুসংক্রান্ত কাজে![২৩] যে মন্ত্রণালয় নিজেই ধুঁকছে বরাদ্দের অভাবে সেই মন্ত্রণালয় নিয়ে এটা বেশ আদিখ্যেতাই বটে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, শিশু বাজেট বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের করণীয়টা আসলে কী? এর কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া আসলেই কি সম্ভব?

শিশু বাজেট থেকে আরও যা যা দেখা যাচ্ছে তা হল স্থানীয় সরকার বিভাগেও শিশু বাজেটের অংশ আছে। এমনকি জননিরাপত্তা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগেও নাকি শিশু বাজেটের অংশ আছে! যা হোক, এভাবে গালভরা নামে শিশু বাজেট, নারী বাজেট সরকার দেখালেও মূল বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দটা কিন্তু ঠিকই কমছে এবং আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যে বরাদ্দটা দিয়েছিল পরবর্তী নয় বছরে আর কখনই ততটা দেয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এই মন্ত্রণালয়ে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সেটি এক দশক আগের বরাদ্দের তুলনায় মাত্র তিন ভাগের দুই ভাগ!

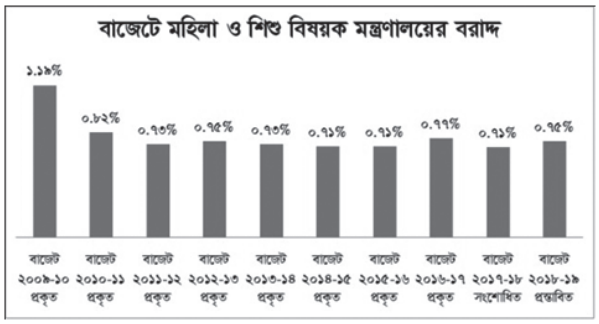

বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দের চেহারা

সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ দিয়েছিল ২ শতাংশের কিছু বেশি। তার পর থেকে পরবর্তী নবম বছর পর্যন্ত একমাত্র ২০১৪-১৫ অর্থবছর ছাড়া বাকি প্রতিটি বছরেই বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ ছিল প্রায় সাড়ে চার শতাংশ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে। এই বছরে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ৪.৯৪ শতাংশ দেখানো হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার তা হল এই যে কয়েক বছর ধরেই সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাবদ ব্যয়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নামে বরাদ্দ দেখাচ্ছে!

এই অর্থবছরেও সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের সমীক্ষা বাবদ বাজেটে মোট বরাদ্দ রেখেছে ১১

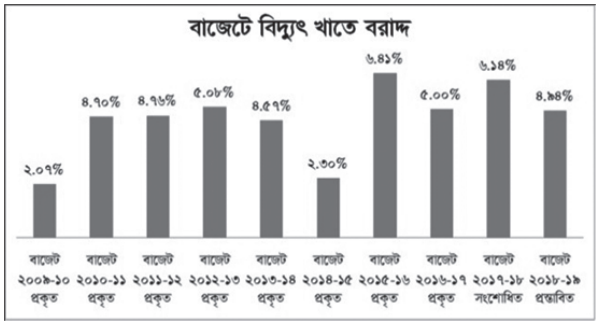

হাজার ৭৪৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা।[২৪] যা মোট বাজেটের প্রায় ২.৫ শতাংশ। সুতরাং প্রকৃত হিসাবে বিদ্যুৎ খাতে আসলে সরকার ৪.৯৪ শতাংশ নয়, বরং প্রায় ৭.৪৪ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে, যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের খরচকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য কী? এর কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত সরকার দেয়নি। অন্যদিকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরকারকে জিডিপির অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে। তাহলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ফলাফল ভাল দেখানোর উদ্দেশ্যে গবেষণায় ব্যয় বেশি দেখানোর জন্যই কি এভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিশাল ব্যয়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের আওতায় দেখানো হচ্ছে? এ প্রশ্নটি কিন্তু যাচাই করে দেখার সময় এসেছে।

এখন এই যে বিদ্যুৎ খাতের ব্যয় বিগত এক দশকে এত বাড়ানো হল সেটির একটি বড় অংশই কিন্তু চলে গিয়েছিল কুইক রেন্টালে ভর্তুকি দেয়ার নামে লুটপাটে (প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত লুটপাটের কথা আপাতত বাদ থাকুক)। অন্যদিকে এই যে এবারের বাজেটে প্রকৃত হিসাবে ৭.৪৪ শতাংশ বিদ্যুৎ খাতের জন্য বরাদ্দ হল, এর মধ্যে ৩.৪ শতাংশই (কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাবদ ব্যয়) কিন্তু আমাদের পরিবেশ ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হবে যেটি ওপরেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে বিদ্যুতে বরাদ্দ বাড়ানোর নামে সরকার একদিকে যেমন জনগণের টাকা লুটপাটের ব্যবস্থা করছে, অন্যদিকে দেশের পরিবেশের ওপর এযাবৎকালের সবচেয়ে তীব্র আক্রমণটি করতে যাচ্ছে।

পরিবহন খাত : নদীর দেশে নৌপথই সবচেয়ে অবহেলিত

সরকারের গত ১০ বছরের বাজেটগুলোর পরিবহন খাতের বরাদ্দের দিকে তাকালে সহজেই চোখে পড়বে যে এই সরকার রেলপথ আর নৌপথকে সড়কপথের তুলনায় খুবই কম গুরুত্ব দেয়। রেলপথ একটা জনবান্ধব, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী পরিবহন মাধ্যম হতে পারত। কিন্তু সরকার রেলপথ খাতটিকে সেদিকে পরিচালিত করেনি কখনও। অন্যদিকে শুনতে খুবই অদ্ভুত হলেও বাস্তবতা বলছে, এই বিপুলসংখ্যক নদীর দেশে পরিবহন খাতের মধ্যে সরকারি বাজেটে নৌপথের বরাদ্দটাই সবচেয়ে কম! সড়কপথের বরাদ্দের তুলনায় সেটি সাত ভাগের এক ভাগেরও কম। সড়কপথের ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার প্রধান কারণটা অবশ্যই এই খাতের প্রকল্পগুলোতে অবাধ লুটপাট করার সুযোগ। আর এ কারণেই বোধ হয় পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ খরচ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য, এবারের বাজেটে সড়ক পরিবহনে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫.২৫ শতাংশ, সেতু বিভাগে বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ২ শতাংশ, রেলপথে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩.১৩ শতাংশ আর নৌপথে মাত্র ০.৭৬ শতাংশ।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

সরকার গত ১০ বছরের বেশির ভাগ বছরেই ধর্ম খাতে যে বরাদ্দ দিয়ে আসছে, সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ দিচ্ছে তার প্রায় অর্ধেক। এমনকি এবারের বাজেটসহ সর্বশেষ দুই বাজেটে সংস্কৃতি খাতের বরাদ্দ ধর্ম খাতে বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম!

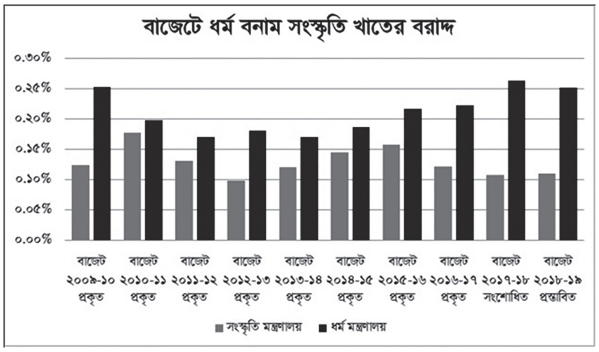

এতক্ষণ গত ১০ বছরে বিভিন্ন খাতের বরাদ্দের যে চেহারাটি দেখানো হল সেটি থেকে দুটি জিনিস খুব পরিষ্কার :

প্রথমত, প্রায় সকল জনগুরুত্বপূর্ণ খাতেই শতাংশের হিসাবে সরকারের বরাদ্দ খুবই কম এবং সেই খুবই কম বরাদ্দও সরকার বছর বছর কমিয়েই যাচ্ছে। এই জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই আজ থেকে ১০ বছর আগে সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে যে বরাদ্দ রেখেছিল ততটুকু বরাদ্দও পরবর্তী ১০ বছরের কোন বছরেই আর দিতে পারেনি। সেই সাথে এই জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই সরকার এই অর্থবছরে যে বরাদ্দ রেখেছে সেটি শতাংশের হিসাবে ১০ বছর আগের বরাদ্দ থেকে কম!

দ্বিতীয়ত, সরকার গত ১০ বছরে বরাদ্দ বাড়িয়েই গেছে মূলত সামরিক বাহিনীকে খুশি রাখতে, জনগণের ওপর দমন-পীড়ন বাড়াতে, সরকারি আমলা-কর্মচারীদের খুশি রাখতে, তাদের বিবিধ সব সুযোগ-সুবিধা দিতে। সেই সাথে সেসব খাতেই সরকার ব্যয় বাড়িয়ে যাচ্ছে, যেগুলোতে লুটপাটের অবাধ সুযোগ আছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে বর্ধিত বরাদ্দের নামে সরকার নিজেই দেশের পরিবেশ ও জননিরাপত্তার জন্য যে বিশাল হুমকি সৃষ্টি করেছে তার সমতুল্য নজির আর নেই। এটাই হল সরকারের উন্নয়নের প্রকৃত চেহারা।

উন্নয়ন ব্যয় কি আসলেই উন্নয়ন ব্যয়?

১০ বছর আগের তুলনায় বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় শতাংশের হিসাবে ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে।[২৫] এবারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৮.৭ শতাংশ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই উন্নয়ন ব্যয় কি আসলেই উন্নয়ন ব্যয়? এই উন্নয়ন ব্যয় মূলত খরচ হয় সরকারের এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পেছনে। এই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লোপাট করার একটা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরই দেখা যায়, এপ্রিল পর্যন্ত অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এডিপির মাত্র অর্ধেকের কিছু বেশি অংশ বাস্তবায়িত হয়। বাকি দুই মাসে তড়িঘড়ি করে অর্থ খরচ করে বছর শেষে বাস্তবায়নের হার ৮০ শতাংশের ওপরে নেয়া হয়। এভাবে তড়িঘড়ির মানে যে লুটপাট, দুর্নীতি আর প্রকল্পের কাজের মান নামানো, সেটা এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু এসব তড়িঘড়ি করার পরও সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ২০১৮ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের অগ্রগতির যে পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেটিতে দেখা যাচ্ছে যে ওই বছরের এডিপির অন্তর্ভুক্ত মাত্র ৪০ শতাংশ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ হয়েছে। অন্যদিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এমন প্রকল্প মাত্র ৫৩.৯২ শতাংশ।[২৬]

বিভিন্ন প্রকল্পের বর্ধিত ব্যয়ের মোট পরিমাণ কত?

গত ১০ বছরের এডিপিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে এগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্পের ভারে ভারাক্রান্ত। এক অর্থবছরের মধ্যে যতগুলো প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ততগুলো শেষ হয় না কখনই। ফলাফল প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে পরবর্তী অর্থবছরের এডিপিতে সেগুলোকে টানতে হয়। সেগুলোর জন্য অর্থও বরাদ্দ রাখতে হয়। তাতে এডিপির আকার বাড়লেও আদতে সেই বর্ধিত এডিপি কোন নতুন উন্নয়ন কর্মসূচি নয়। অন্যদিকে দফায় দফায় বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয় সংশোধন করে বাড়ানো হয়। এভাবে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর প্রধান কারণ যে লুটপাট ও দুর্নীতি সেটিও এখন মোটামুটি সর্বজনবিদিত। এমনকি আজকাল মূলধারার অনেক অর্থনীতিবিদই সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন যে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানোর জন্যই কি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে?

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দের প্রায় ৯১ শতাংশ যাচ্ছে ৯টি খাতে। এই খাতগুলো হল : কৃষি, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ, বিদ্যুৎ, পরিবহন, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ, শিক্ষা ও ধর্ম, স্বাস্থ্য পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ এবং বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই ৯টি খাতের শুধু বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর দিকেই যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখা যাবে এই ৯টি খাতে এমন ১৩৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে, যেগুলোতে বিভিন্ন সময় সংশোধন করে প্রকল্প ব্যয় (এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়াদও) বাড়ানো হয়েছে। এই ১৩৬টি প্রকল্পের বর্ধিত ব্যয়ের মোট পরিমাণটি হতভম্ব করে দেয়ার মত। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিগুলো থেকে এই প্রকল্পগুলোর প্রারম্ভিক নির্ধারিত ব্যয় নিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে যে এই ১৩৬টি প্রকল্পের মোট বর্ধিত ব্যয়ের পরিমাণ ৯৭ হাজার ১৮৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা (বিস্তারিত দেখুন সারণি-১ এ)। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরের সমগ্র প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের যোগফলের প্রায় সমান! এই অর্থ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় থেকে ৯,০৯৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বেশি! এই অর্থ এই অর্থবছরের অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন ব্যয়ের ৫৪ শতাংশ।[২৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন ব্যয় এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে সেই বর্ধিত ব্যয় দিয়ে দুই বছর আগেও একটা গোটা উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন করা যেত এবং তার পরও যে টাকাটা বাকি থাকত সেটি দিয়ে দুই বছর আগে স্বাস্থ্য খাতে মোট উন্নয়ন ব্যয়কে আড়াই গুণ বাড়ানো যেত![২৮]

এ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয়ের বিশ্লেষণ থেকে আরও যা দেখা যাচ্ছে (সারণি-১) তা হল প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি হল পরিবহন খাতে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে আছে যথাক্রমে বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান খাত, শিক্ষা খাত এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ খাত। পরিবহন খাতে এ বছর এডিপির সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে, যেটি প্রায় ২৬.২৭ শতাংশ। পরিবহন খাতের অন্তর্ভুক্ত ২৬টি প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন সময় যতটুকু

সারণি-১: এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির চালচিত্র

খাত	এ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকা)	এই বরাদ্দ এ বছরের এডিপির কত শতাংশ	সংশোধিত প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি (কোটি টাকা)	সংশোধিত প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয় বৃদ্ধি এই অর্থবছরে এই খাতে মোট বরাদ্দের কত শতাংশ	এই অর্থবছরের বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ কমপক্ষে কত (কোটি টাকা)	এই অর্থবছরের বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ কমপক্ষে কত (শতাংশ)
কৃষি	৭০৭৬.২২	৪.০৯	২৭	১২৩৬.৬৫	১৭.৫%	৩৪২.৭৯	৪.৮%
পলি উন্নয়ন ও পলি প্রতিষ্ঠান	১৬৬৯০.৩০	৯.৬৫	২৪	১৫০৭১.১১	৯০.৩%	২৪৩৭.৩৩	১৪.৬%
পানিসম্পদ	৪৫৯২.৭৮	২.৬৫	৪	৪৪৩.৭০	৯.৭%	২১	০.৫%
বিদ্যুৎ	২২৯৩০.২০	১৩.২৫	২	২৬৯.৫১	১.২%	৯৫	০.৪%
পরিবহন	৪৫৪৪৯.৮৭	২৬.২৭	২৬	৪৩৩৭০.১৯	৯৫.৪%	৬৯৩৪.২৪	১৫.৩%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১৭৮৮৯.৯৫	১০.৩৪	২৯	৮৯৩২.২৬	৪৯.৯%	১১৮৯.৬৫	৭%
শিক্ষা ও ধর্ম	১৬৬২০.৩৩	৯.৬১	১৩	১৪২১৬.২৭	৮৫.৫%	২৫৪৩.৬৪	১৫.৩%
স্বাস্থ্য পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	১১৯০৫.০৭	৬.৮৮	৩	৭৭৮.২০	৬.৫%	১৫.৭৫	০.১%
বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৪২১০.৭৩	৮.২১	৮	১২৮৬৭.৭৫	৯০.৫%	৪০৫.৭৭	২.৯%
সর্বমোট	১৫৭৩৬৫.৪৫	৯০.৯৫	১৩৬	৯৭১৮৫.৬৪	৬১.৮%	১৩৯৮৫.১৭	৮.৯%

বাড়ানো হয়েছে তার পরিমাণ এ বছর পরিবহন খাতে এডিপিতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার ৯৫.৪ শতাংশ। বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অন্তর্ভুক্ত ৮টি প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ এ বছরে এই খাতের এডিপির ৯০.৫ শতাংশ। এটি মূলত রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে হয়েছে। যদিও সরকার এডিপিতে এই প্রকল্পটি এখনও সংশোধিত হিসেবে দেখাচ্ছে না, কিন্তু বাস্তবতা হল এটির যে ব্যয় শুরুতে দেখিয়ে এটিকে পাস করানো হয়েছিল তার চেয়ে এটির ব্যয় ১২ হাজার কোটি টাকা বেশি দেখিয়ে এটিকে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের হিডেন কস্টগুলো যোগ করলে এই ব্যয় আরও বাড়বে সন্দেহ নেই। পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান খাতের ২৪টি প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন সময়ে যতটুকু বাড়ানো হয়েছে তার পরিমাণ এ বছরের সেই খাতের এডিপির ৯০.৩ শতাংশ। শিক্ষা ও ধর্ম খাতের ১৩টি প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন সময় যতটুকু বাড়ানো হয়েছে তার পরিমাণ এ বছরের শিক্ষা খাতের এডিপির প্রায় ৮৬ শতাংশ। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি ৮৪ শতাংশের মত। ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ খাতের ২৯টি প্রকল্পের ব্যয় বিভিন্ন সময়ে যতটুকু বাড়ানো হয়েছে তার পরিমাণ এই খাতের এ বছরের এডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ।

এবারের এডিপিতে বিভিন্ন খাতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ কমপক্ষে কত?

প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয়ের সাথে আমরা যদি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় এবং এই বছরে প্রকল্প বাবদ বরাদ্দকে তুলনা করি তা থেকে এটা বলা যায় যে পরিবহন এবং শিক্ষা ও ধর্ম–এ দুই খাতে এ বছর এডিপিতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার প্রতিটিতেই কমপক্ষে ১৫.৩ শতাংশ হল প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ব্যয় (শুধু শিক্ষা খাতে এটি ১৪ শতাংশ হবে)। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান খাতেও এ বছর এডিপিতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার কমপক্ষে ১৪.৬ শতাংশ হল প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ। সুতরাং এই প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির বিশেষণ থেকে এটাও দেখা যাচ্ছে যে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি শিক্ষা খাতও এখন লুটপাটের একটা প্রধান আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিতে লুটপাটের সহজ জায়গা অবকাঠামো নির্মাণ খাতের সাথে পালা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কমপক্ষে বলার কারণ ফেব্রুয়ারির পরে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সময়ের খরচ যখন প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত খরচের সাথে যুক্ত হবে তখন প্রকল্পের এবছরের বরাদ্দে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত খরচের অংশ আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি বিষয়ক আরও বিস্তারিত রয়েছে সারণি-১ এ।

প্রকল্প ব্যয় না বাড়িয়েও লুটপাট চালানো যায়

প্রকল্প ব্যয় না বাড়িয়েও এডিপির প্রকল্পে লুটপাটের আরেকটি ধরন হচ্ছে শুরুতেই প্রয়োজনের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি ধরে প্রকল্প পাস করানো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সব হিসাবেই সড়ক নির্মাণের ব্যয় বাংলাদেশে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে প্রতি কিলোমিটারের জন্য খরচ পড়ছে ১ কোটি ১৯ লাখ ডলার! এই সড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি খরচ ভারতের কিছু সড়কের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি। চার লেনের সড়ক নির্মাণে ভারত ও চীনে খরচ পড়ে ১১ লাখ থেকে ১৬ লাখ ডলার।[২৯]

বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পগুলোতে দুটি ছাড়া আর কোনটিতেই প্রকল্প ব্যয় সংশোধন করে বৃদ্ধি করা হয়নি। কিন্তু এই খাতে এমন অনেক প্রকল্প আছে, যেগুলোতে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়নি ঠিকই, কিন্তু প্রকল্পটি নেয়াই হয়েছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি খরচ দেখিয়ে। এখানে স্রেফ ৫টি প্রকল্পের সামান্য বিবরণ দেয়া যাক। খোদ সরকারেরই বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবারের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টটিতে কিলোওয়াটপ্রতি নির্মাণ খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ! অন্যদিকে একই প্রতিবেদন অনুসারে এবারের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পটিতে কিলোওয়াটপ্রতি যে ব্যয় হচ্ছে সেটি বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ।[৩০] অন্যদিকে খুলনা ডুয়েল ফুয়েল ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পটির ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে ঠিকমত মেরামত করেই খুলনার পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্রের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব এবং সেটা এর তিন ভাগের এক ভাগ খরচে। অর্থাৎ এই নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে কয়েক গুণ বেশি দামে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাচ্ছে সরকার।[৩১] ঘোড়াশাল-৩ বিদ্যুৎকেন্দ্র রিপেয়ারিং প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন, বেজমেন্ট নির্মাণ–এসব খাতে কোন ব্যয় না থাকার পরও সেখানে ব্যয় ধরা হয়েছে অনেক বেশি।[৩২] আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুরুতে অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে প্রকল্প বাতিল করে দেয় পরিকল্পনা কমিশন। এরপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী এটিতে সর্বোচ্চ ২,৮৮০ কোটি টাকা লাগতে পারে বলে মত দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৯৩১ কোটি টাকা।[৩৩] উপরিল্লিখিত এই প্রকল্পগুলোর কোনটিতেই কিন্তু প্রকল্প ব্যয় সংশোধন করে বাড়ানো হয়নি। হয়ত তার প্রয়োজন নেই তাই। এই ৫টি প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৩,৬৫৬ কোটি টাকারও বেশি।[৩৪] এমন উদাহরণের অভাব নেই।

প্রকল্প নেয়া হয় কার প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে?

এডিপির প্রকল্পগুলোর বেশির ভাগই আসলে নেয়া হয় দলীয় বিবেচনা মাথায় রেখে। এখানে কেবল কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। এ বছর শিক্ষা খাতে দুটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যেগুলোতে সাংসদদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ নিজ সংসদীয় এলাকায় ১০টি নতুন স্কুল ভবন বানানো হবে এবং ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে। এই প্রকল্প দুটি হল নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প। সর্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন নামের পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান খাতের আরেকটি প্রকল্পের অধীনে সাংসদদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হবে। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পগুলো সাংসদদের ইচ্ছাধীন করার মাধ্যমে শুরু থেকেই এগুলোতে লুটপাট ও অনিয়মের শর্ত তৈরি করে রাখা হয়েছে। এই তিন প্রকল্প মিলে মোট খরচ হবে ১৬ হাজার ৫৫২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।[৩৫] এই অর্থ এবারের এডিপির মোট ৯ শতাংশ। অর্থনীতিবিদরা ইতোমধ্যেই এই তিন প্রকল্পকে সাংসদদের জন্য নির্বাচনি ঘুষ হিসেবে অভিহিত করা শুরু করেছেন।[৩৬]

এদিকে গত বছর প্রথম আলো রিপোর্ট করেছিল যে রেলওয়েতে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় সবচেয়ে বেশি বিবেচনায় নেয়া হয় : রাজনৈতিক স্বার্থ, ঠিকাদারের স্বার্থ এবং কমিশন বাণিজ্য। জনস্বার্থ এখানে উপেক্ষিত বিষয়। রেলওয়ের সূত্রের বরাতে প্রথম আলো আরও জানিয়েছিল, রেলের রেললাইন নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের ৮০ শতাংশ কাজের সাথে জড়িয়ে আছে দুটি ঠিকাদার গ্রুপ। এই দুটি

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে রেলের নিজের কংক্রিট স্লিপার তৈরির কারখানাকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়ায় রেলপথ বানালে উত্তরবঙ্গের সাথে রেলে দূরত্ব কমে যায় ১৩০ কিমি। কিন্তু এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রেলের আগ্রহ কম।[৩৭] একই রকমভাবে বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রচলিত রেলপথের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি ব্যয়সাশ্রয়ী হলেও সেই প্রকল্প গ্রহণে রেলের আগ্রহ নেই। সেই প্রকল্প ২০২৫ সালের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এখন যেমন এক কিলোমিটার ট্রেন চালাতে খরচ হয় ১,১০০ টাকা, সেই খরচ মাত্র ২৪ টাকায় নেমে আসত![৩৮] সকল খাতেই এ রকম উদাহরণের অভাব নেই।

একটা গোটা এডিপি ব্যয়িত হবে পরিবেশ ধ্বংস ও জননিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকি সৃষ্টিতে!

এবারের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত আরও ৮টি প্রকল্পের (নির্মাণ নয়, অন্যান্য ফিজিবিলিটি স্টাডি, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি) মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।[৩৯] এই প্রকল্পগুলো যে দেশের পরিবেশ ও জননিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ সেটি নিয়ে এখন একমাত্র সরকার ও প্রকল্পগুলোর দালালবাহিনী ছাড়া আর কারও মধ্যেই কোন তর্ক নেই। তার পরও গায়ের জোরে এসব প্রকল্প সরকার নিচ্ছেই। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরের সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা।[৪০] তার মানে, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুতের নামে সরকার আসলে একটা গোটা এডিপির সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে যাচ্ছে মূলত পরিবেশ ধ্বংস ও দেশের জননিরাপত্তাকে ভয়াবহ হুমকির মুখে ফেলার কাজে। আগামী বছরগুলোতে এই ব্যয় আরও বাড়বে, বিশেষত যখন অন্যান্য কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের খরচগুলো যোগ হবে। এবং রূপপুরের হিডেন কস্টগুলো যোগ হবে।

এ ছাড়াও পরিবেশ ও জননিরাপত্তার প্রশ্নটি যদি বাদও দেই তাহলেও যেখানে এক রূপপুর প্রকল্পের ব্যয়ই সরকারের বছর দুয়েক আগের সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় থেকে বেশি[৪১] সেখানে এই প্রশ্নটি তো তোলা দরকার যে এমন ব্যয়বহুল প্রকল্প কী করে সুলভ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ আমাদের দেবে? দুনিয়ার আর কোন কোন দেশে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের নাম করে কেবল একটি প্রকল্পতেই সেই দেশের এডিপির প্রায় সমান ব্যয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে আমাদের জন্য।

এই টাকা দিয়ে কী পরিমাণ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত?

সারা দুনিয়া যেদিকে যাচ্ছে সেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সরকার এ বছরের এডিপিতে মাত্র ৩৭৬ কোটি ১৮ লাখ টাকার ৪টি নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুতের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেছে।[৪২] অথচ এই যে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যেই ১০টি কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ক প্রকল্পের পেছনে খরচ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই অর্থ দিয়ে সরকার চাইলে বিপুল পরিমাণ বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারত, যার কোন পরিবেশগত ও জননিরাপত্তাগত হুমকি থাকত না। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের জন্য সেটি টেকসইও হত। পাশাপাশি সেই বিদ্যুৎ হত কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুতের চেয়ে অনেক সস্তা।

ওই টাকাটা দিয়ে কতটা সৌর কিংবা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে তার একটা হিসাব দেয়া যাক। সম্প্রতি নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এনরেল বাংলাদেশের জন্য উইন্ড ম্যাপ করে দিয়েছে সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে। সেই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ বাতাস আছে তাতে লাভজনকভাবে শুধু উপকূলীয় অঞ্চলেই ১০ হাজার মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো সম্ভব। এ বিষয়ে এনরেলের গবেষকদের একটি সাক্ষাৎকার নিউ এজের জন্য আমি গত মাসে নেই।[৪৩] আগ্রহীরা সেটি পড়ে দেখতে পারেন। এনরেলের প্রতিবেদনে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের যে হিসাব দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে এশিয়ায় প্রতি মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে গড় খরচ পড়ে ১১-১৬ কোটি টাকা।[৪৪] অন্যদিকে প্রতি মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে এখন খরচ হয় প্রায় ছয় কোটি টাকা।[৪৫]

এসব হিসাব যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে বলা যায় যে সরকার পারমাণবিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের পেছনে ইতোমধ্যেই যে টাকাটা খরচ করবে বলে এডিপিতে প্রকল্প নিয়েছে, সেই টাকা দিয়ে সারা দেশে ৯৭০০ মেগাওয়াট থেকে ১৪ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত সক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। ৩০ শতাংশ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরে যার থেকে আমরা বছরে গড়ে অন্তত ২৯০০ থেকে ৪২০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পেতে পারি। অন্যদিকে ওই টাকাটা দিয়ে ২৫৯০০ মেগাওয়াটের বেশি সক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা দেশজুড়ে বসাতে পারি। ২০ শতাংশ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টরে যার থেকে আমরা বছরে গড়ে অন্তত ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে পারি। উল্লেখ্য, উপরোক্ত ১০টি প্রকল্পের মূল খরচ আসলে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা থেকে আরও অনেক বেশি হবে। কারণ এখানে মাতারবাড়ী আর রূপপুর ছাড়া বাকি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মূল নির্মাণ খরচ যখন এখনও যোগ হয়নি।

সরকারি প্রতিবেদন থেকেই এডিপির প্রকল্পে ব্যাপক লুটপাট ও নয়ছয়ের যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যায়

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এডিপির বাস্তবায়নের যে সর্বশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, সেখানে তারা নিজেরাই যেসব সমস্যার কথা স্বীকার করেছে তা হল :

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বা ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটিকে তারা এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যাবলির মধ্যে এক নম্বরে রেখেছে! (২) বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের অগ্রগতি সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও ফলাফল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। (৩) ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। (৪) প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সক্ষমতার ঘাটতি আছে। (৫) প্রকল্পগুলোর বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট হয় না। (৬) ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন বা তদারকি করা হচ্ছে না। (৭) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্মাণসামগ্রীর গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক কোন তদারকির ব্যবস্থা নেই! (৮) প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহী ও অনভিজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে! (৯) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রবণতা রয়েছে এবং আবাদি জমি গ্রহণ করে অধিক ব্যয়ে তা উন্নয়ন করার প্রবণতা রয়েছে।[৪৬]

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পগুলো যে জনগণের সম্পদ লুটপাট, অপচয় আর অদক্ষতার একটা আখড়ায় পরিণত হয়েছে, এগুলোর বেশির ভাগই যে দলীয় উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, উপরিল্লিখিত সরকারি প্রতিবেদনটিতে চিহ্নিত সমস্যাবলি দেখার পর সে বিষয়ে অন্যদের আর কিছু বলার দরকার আছে কি?

একটি জরুরি রাজনৈতিক কাজ

বাজেটে বছরের পর বছর ধরে লুণ্ঠন, সম্পদ পাচার আর সম্পদের কেন্দ্রীভবনের ধারাবাহিকতা চলমান থাকলেও সরকার তথা শাসকশ্রেণি সাফল্যের সঙ্গে বাজেটের ব্যাপারে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পেরেছে। বাজেট তাই জনগণের কাছে এখন বড়জোর জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো-কমানোর একটা বিষয়। লুণ্ঠন মসৃণ করার একটা অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণকে অন্ধকারে রেখে সে বিষয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখা। বাজেটের বিষয়ে জনগণকে অন্ধকারে রাখার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি তাই সফল। বাজেটে কোন খাতে কিভাবে জনগণের টাকা লোপাট করা হচ্ছে, সে বিষয়ে জনগণকে অন্ধকারে রাখা যাচ্ছে বলেই যখনই কোন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য দাবি তোলা হয়, তখন সরকার টাকা না থাকার গল্প শোনানোর সাহস পায়। এডিপির বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত জনসমক্ষে কখনও প্রকাশ পায় না দেখেই জনগণ কখনও জানতেও পারেন না যে তাদের টাকা দিয়ে কিভাবে লুটেরাদের পকেট ভারী করা হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে, তারা জানতেও পারেন না কিভাবে অপ্রয়োজনীয় সব প্রকল্প নিয়ে তাদের টাকাকে নয়ছয় করা হচ্ছে। সরকার জমিদার স্টাইলে তার ইচ্ছামত খাতে বরাদ্দ বাড়ায়। লোকচক্ষুর আড়ালে চুপিসারে সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়ায়, জনশৃঙ্খলা খাতের বরাদ্দ বাড়ায় আর আমাদের শুনতে হয় যে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য সরকারের কাছে টাকা নেই! পাশাপাশি শাসকশ্রেণি ও তার মিডিয়া বাজেট আলোচনার নামে এমন এক আবহ তৈরি করে রেখেছে সমাজে যে তাতে সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয় যে বাজেট আলোচনা নিশ্চয় অনেক ভারী একটা জিনিস। সেটি শুধু 'পণ্ডিতদের', 'অর্থনীতিবিদদের' আলোচ্য বিষয়, সাধারণের তাতে কোন স্থান নেই। সাধারণের পক্ষে সেই আলোচনায় অংশ নেয়া সম্ভব নয়।

বাজেট বিষয়ে শাসকশ্রেণির তৈরি করা এই চক্রকে ভাঙতে হলে সর্বাগ্রে তাই যেটি করা প্রয়োজন তা হল বাজেটকে জনবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করে সেটিতে বিদ্যমান জনস্বার্থবিরোধী দিকগুলোকে জনগণের সামনে উন্মোচন করা, জনগণের মাঝে সেগুলোর ব্যাপক প্রচার করা। পাশাপাশি বাজেট নিয়ে ঢালাও বক্তব্য, মেঠো বক্তৃতা বাদ দিয়ে বাজেটের প্রতিটি বরাদ্দের বিস্তারিত, প্রতিটি প্রকল্পের নামে কী কী করা হচ্ছে তার বিস্তারিত জনগণের সামনে উন্মুক্ত করার দাবি তোলা এবং সেই সাথে বাজেট পাশের আগে জনগণের সম্মতি গ্রহণের কোন মেকানিজম দাঁড় করানোর দাবিতে জনগণকে সংগঠিত করা এখন এদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য একটা জরুরি রাজনৈতিক কাজে পরিণত হয়েছে। জনগণকে যত বেশি অবগত করা যাবে ততই শাসকশ্রেণি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। প্রশ্নের শক্তি যে কতটা ধারালো হয় সেটা এদেশের শাসকশ্রেণি খুব ভালভাবেই জানে।

১ জুলাই ২০১৭

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ: লেখক, সাংবাদিক।
ইমেইল: mahtabjuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, অর্থনীতিতে লুণ্ঠন, পাচার ও সম্পদ কেন্দ্রীভবনের ধারাবাহিকতা, সর্বজনকথা ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আগস্ট ২০১৫) এবং ইশতিয়াক রায়হান, মেগা বাজেট মেগা সংশয়, শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রকৃত চিত্র, সর্বজনকথা ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আগস্ট-অক্টোবর ২০১৭)

২. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, গোষ্ঠীতন্ত্রের পছন্দের বাজেট, প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১৮

৩. Study on Credit Risk arising in the Banks from Loans Sanctioned against Inadequate Collateral, Bangladesh Bank, 29 August, 2017

৪. 4-Lane Dhaka-Ctg Highway: Up for mending all too soon, The Daily Star, April 7, 2018

৫. অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ২০১৮-১৯

৬. মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট : শিক্ষা খাতে বরাদ্দের চালচিত্র, সর্বজনকথা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আগস্ট ২০১৬)

৭. গাড়ি কিনতে সুদ ছাড়াই ৩০ লাখ টাকা ঋণ, প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০১৭

৮. মন্ত্রী-সচিবদের ফোন ব্যবহারে থাকছে না নির্ধারিত সীমা, প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৮

৯. ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে গত অর্থবছর পর্যন্ত প্রস্তাবিত আর প্রকৃত বাজেটগুলো থেকে হিসাব করা। ডাটা নেয়া হয়েছে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে

১০. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.ZS?end=2017&start=2017&view=chart

১১. কামাল আহমেদ, বাজেট নিয়ে কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন, প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১৮

১২. ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে গত অর্থবছর পর্যন্ত প্রস্তাবিত আর প্রকৃত বাজেটগুলো থেকে হিসাব করা। ডাটা নেয়া হয়েছে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে

১৩. এডিপি ২০১৮-১৯, বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের প্রকল্পসমূহ

১৪. ১ নং তথ্যসূত্র, প্রথম অংশ

১৫. State of Bangladesh Economy in FY 2015-16 (Third reading), Centre for Policy Dialogue, 25 May, 2016

১৬. ৬ নং তথ্যসূত্র

১৭. ১৫ নং তথ্যসূত্র

১৮. এডিপি ২০১৮-১৯, বিদ্যুৎ খাত এবং বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের প্রকল্পগুলো থেকে হিসাব করা

১৯. ২৮ হাজার পোশাক কারখানার জন্য পরিদর্শক মাত্র ৩৯ জন, প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০১৩

২০. ৫০০০ বয়লার পরীক্ষায় মাত্র ৮ জন পরিদর্শক, ইত্তেফাক, ৫ জুলাই ২০১৭

২১. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2018, UNESCAP, United Nations 2018

২২. বন্ধ হয়ে যেতে পারে পাট থেকে পলিথিন উৎপাদন প্রকল্প, বাংলা ট্রিবিউন, ১০ মে ২০১৮

২৩. শিশু বাজেট ২০১৮-১৯, অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট

২৪. ১৮ নং তথ্যসূত্র

২৫. ১২ নং তথ্যসূত্র

২৬. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া)

২৭. অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত

বাজেটের ডাটা থেকে হিসাব করা
২৮. ঐ
২৯. সড়ক নির্মাণ খরচ বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি, ডেইলি স্টার বাংলা, ২১ জুন ২০১৭
৩০. ব্যয়বহুল সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শেষ নিয়েও সংশয়, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩১. কয়েক গুণ বেশি টাকায় খুলনায় বিদ্যুৎকেন্দ্র, আমার সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩২. বিদ্যুৎকেন্দ্র রিপেয়ারিংয়ের নামে লুটপাটের আয়োজন, মানবজমিন, ১ অক্টোবর ২০১৪
৩৩. আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ প্রকল্পে অস্বাভাবিক ব্যয় প্রস্তাব, সমকাল, ২৫ মে ২০১৫
৩৪. এডিপি, ২০১৮-১৯ অর্থবছর
৩৫. এডিপি, ২০১৮-১৯ অর্থবছর, শিক্ষা ও ধর্ম খাত এবং পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান খাতের প্রকল্প
৩৬. হোসেন জিলুর রহমান, ঝুঁকি এড়াতে গভীর ঝুঁকি থেকে গেল, প্রথম আলো, ৭ জুন ২০১৮
৩৭. কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বেশি মনোযোগ, প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭
৩৮. রেলের লোকসানপ্রীতি, কালের কণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০১৬
৩৯. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপির বিদ্যুৎ খাত এবং বিজ্ঞান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত থেকে হিসাব করা
৪০. অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বাজেটের ডাটা
৪১. অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বাজেটের ডাটা
৪২. এডিপি, ২০১৮-১৯ অর্থবছর, বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প
৪৩. Bangladesh has huge potentiality in wind power, New Age, 13 June 2018
৪৪. Mark Jacobson, Taj Capozzola, Zared A Lee, Assessing the wind energy potential in Bangladesh (বাংলাদেশ সরকারের কাছে তুলে ধরা এনরেলের এক্সিকিউটিভ সামারির প্রেজেন্টেশন)
৪৫. শিল্প ও কৃষিসহ সকল ঘরে সুলভ পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ কিভাবে সম্ভব, *বিকল্প মহাপরিকল্পনা*, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, ৩য় সংস্করণ, মে ২০১৮
৪৬. ২৬ নং তথ্যসূত্র